بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ   نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ   وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

মসীহ মওউদ সংখ্যা

সংখ্যা 9-10

বার্ষিক চাঁদা
৫০০ টাকা

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান
Weekly
BADAR Qadian
Bangla

বর্ষ-৬
সম্পাদক:
তাহের আহমদ
মুনির

Postal Reg. No. GDP/ 43 /2020 -2022   4-11 মার্চ, 2021 ❍ 4-11 আমান 1400 হিজরী শামসী ❍ 19-26- রজব, 1442, হিজরী কামরী

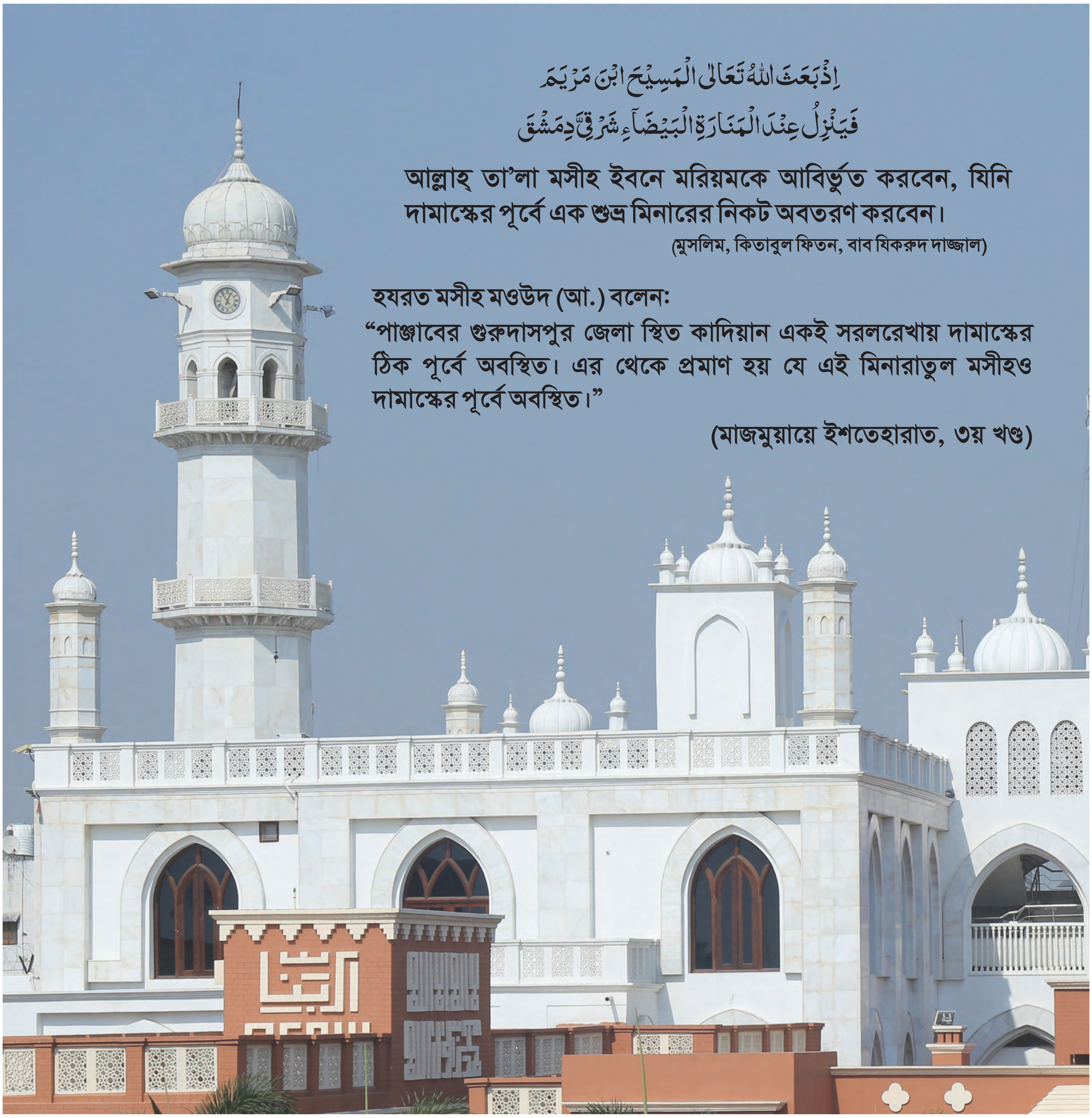

اِذۡ بَعَثَ اللّٰہُ تَعَالٰی الۡمَسِیۡحَ ابۡنَ مَرۡیَمَ
فَیَنۡزِلُ عِنۡدَ الۡمَنَارَۃِ الۡبَیۡضَآءِ شَرۡقِیَّ دِمَشۡقَ

আল্লাহ্ তা'লা মসীহ ইবনে মরিয়মকে আবির্ভূত করবেন, যিনি দামাস্কের পূর্বে এক শুভ্র মিনারের নিকট অবতরণ করবেন।

(মুসলিম, কিতাবুল ফিতন, বাব যিকরুদ দাজ্জাল)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

"পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলা স্থিত কাদিয়ান একই সরলরেখায় দামাস্কের ঠিক পূর্বে অবস্থিত। এর থেকে প্রমাণ হয় যে এই মিনারাতুল মসীহও দামাস্কের পূর্বে অবস্থিত।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড)

মসজিদ মুবারক (কাদিয়ান)

মসজিদ আকসা (কাদিয়ান)

মসজিদ দারুস সালাম (সাউথ হল, ইউ.কে)

বায়তুল আফিয়াত(আলমিরে, হল্যাণ্ড)

BAITUN NASSIR
MAKHZAN TASAWEER

মসজিদ বায়তুন নাসীর (আগাসবার্গ, জার্মানী)

MAKHZAN TASAWEER

মসজিদ মাহমুদ (সুইডেন)

MUBARAK MOSCHEE
DIE GESEGNETE MOSCHEE
MAKHZAN TASAWEER

মসজিদ মুবারক (উইযবাদন, জার্মানী)

MAKHZAN TASAWEER

মসজিদ বায়তুল মুকীত (ওয়াসসাল, ইউ.কে)

জামাত আহমদীয়া আজ বিশ্বের ২১৩টি দেশে প্রতিষ্ঠিত। আলহামদোলিল্লাহ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জামাত আহমদীয়া দ্বারা নির্মিত গুটিকয়েক মসজিদের নয়নভিরাম চিত্র।

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ও সূচিপত্র ১
মহানবী (সা.)-এর বাণী ২
হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী ৩
অতীতের বুযুর্গদের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা ৪
হাকাম ও আদাল হিসেবে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা। ৬
সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর সত্যতার প্রমাণ ৮
মিনারাতুল মসীহর নির্মাণ, ইতিহাস এবং চাঁদাদাতাদের নামসমূহ ১৩
হযরত মসীহ মওউদ এর সপক্ষে (আরবী) বাক্যরচনা ও ধর্মীয় তর্কযুদ্ধের সময় ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের ঈমান উদ্দীপক ঘটনা ১৫

সম্পাদকীয়

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

হযরত মসীহ মওউদ (আ)-এর পুরস্কার সম্বলিত চ্যালেঞ্জ

আমি প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহ্বান করেছি

اِنَّ السُّمُوْمَ لَشَرُّ مَا فِي الْعَالَمِ ✿ شَرُّ السُّمُوْمِ عَدَاوَةُ الصُّلَحَاءِ

‘সিররুল খিলাফা’ পুস্তকের ভুল বের করতে পারলে প্রতিটি ভুলের জন্য একটাকা করে পুরস্কারের ঘোষণা

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবীর সৈয়দানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর প্রতি বিশেষ বৈরিতা ছিল। তিনি বারাহীনে আহমদীয়ার রিভিউ লিখেছিলেন। নিঃসন্দেহে তিনি তার রিভিউতে অত্যন্ত জোরালো ভাষায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এবং তাঁর যুগান্তকারী রচনা বারাহীনে আহমদীয়ার সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু বাস্তবে সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর খ্যাতি এবং বারাহীনে আহমদীয়াতের জনপ্রিয়তার কারণ মহম্মদ হোসেনের রিভিউ ছিল না। বরং বারাহীনে আহমদীয়াতের জনপ্রিয়তার কারণ ছিল এর মধ্যে বর্ণিত মনমুগ্ধকর সেই সব মজবুত যুক্তিপ্রমাণসমূহ এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর জনপ্রিয়তার কারণ ছিল তাঁর পূর্ণ, তাকওয়া এবং মহাসম্মানিত আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর সত্তায় সন্নিবিষ্ট এক আধ্যাত্মিক আকর্ষণ। এছাড়াও তাঁর জনপ্রিয়তার একটি মূখ্য কারণ ছিল তিনি ছিলেন ইসলামের এক অসীম সাহসী যোদ্ধা ও অবিচল সেনাপতি যার সামনে কেউ দাঁড়ানোর সাহস করত না। মহম্মদ হোসেনের দুর্ভাগ্য, তিনি মনে করে বসলেন যে, বারাহীনে আহমদীয়ার জনপ্রিয়তা এবং সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর খ্যাতির মূলে রয়েছে তাঁর লেখা রিভিউ। যখন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ১৮৯০ সালে প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী হওয়ার দাবি করলেন, তখন মহম্মদ হোসেন গেলেন বিগড়ে। তিনি ভাবলেন, আমার সঙ্গে পরামর্শ না করেই তিনি কিভাবে নিজেকে প্রতিশ্রুত মসীহ হওয়ার দাবি করে বসলেন! দীর্ঘ তর্কবিতর্কের পর মহম্মদ হোসেন বাটালবী হযরত মসীহ মওউদ (আ.) সম্পর্কে লিখলেন,

‘ইশায়াতুস সুন্নাহ যেভাবে তাকে (অর্থাৎ সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ আ.কে) পূর্ববর্তী দাবীর সাপেক্ষে আকাশে তুলেছিল, ঠিক অনুরূপভাবে নতুন দাবির দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে ভূলুণ্ঠিত করাও এর কর্তব্য ও দায়িত্বাবলীর মধ্যে একটি। ’

(তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৬)

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর বিরোধীতায় মহম্মদ হোসেন বাটালবী নিজেকে এবং তার পত্রিকাকে নিয়োজিত করে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাকে উত্তরে লেখেন–

‘এতে আমার মোটেই দুঃখ হচ্ছে না যে আপনার মত বন্ধু বিরোধিতায় উদ্যত হয়েছে। কাল আমি নিজের হাতে নিজের সম্পর্কে লিখতে দেখেছি যে, ‘আমি একা আর খোদা আমার সঙ্গে আছেন। আর এরই সাথে আমাকে ইলহাম হয়েছে, ‘ইন্না মাঈ রাব্বী সাইয়াহদীনি’। অতএব আমি জানি, খোদাওয়ান্দ তা’লা নিজ সন্নিধান থেকে কোনও ‘হুজ্জাত’ (অকাট্য যুক্তি-প্রমাণ) প্রকাশ করে দিবেন। আমি আপনার জন্য দোয়া করব। কিন্তু আপনার জন্য যা কিছু নির্ধারিত আছে তা আপনার হাতেই পূর্ণ হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ”

(তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩৮৬)

আমার দুঃখ হয় যে, মহম্মদ হোসেন বাটালবীর বিরোধিতার পন্থা নিতান্তই নিকৃষ্ট মানের ছিল। তার মধ্যে নিষ্ঠা বলে কোনও জিনিষই ছিল না। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিরোধিতায় মহম্মদ হোসেন যাবতীয় নৈতিকতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। নির্দ্বিধায় মিথ্যা বলেছেন। তাঁর মিথ্যা অভিযোগসমূহের মধ্যে এটিও একটি ছিল যে , হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কুরআন এবং আরবী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। এর উত্তরে সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার করার জন্য কুরআন মজীদের তফসীর লেখার চ্যালেঞ্জ জানান। কেরামাতুস সাদেকীন এবং নুরুল হক পুস্তক বাগ্মিতাপূর্ণ আরবী ভাষায় রচনা করেন এবং এর সমতূল্য পুস্তক রচনার চ্যালেঞ্জ জানান।এমনকি এর জন্য বিরাট অঙ্কের পুরস্কারও ধার্য করেন। আর এই পুস্তকের ভুল বের করতে পারলে ভুল প্রতি একটাকা করে পুরস্কার রাখেন। পরে সেই পুরস্কারকে বাড়িয়ে দুটাকা করে দেন। পুরস্কার সম্বলিত সেই চ্যালেঞ্জ সম্পর্কে সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর উদ্ধৃতি নিম্নে দেওয়া হল। তিনি মহম্মদ হোসেন বাটালবীকে সম্বোধন করে বলেন–

“ একান্ত শুভাকাঙ্খা হিসেবে আমি তাকে শেষ বারের মত আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এবং পূর্ববর্তী পুস্তিকার প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে ‘সিররুল খিলাফাহ’-র দিকে শেখ সাহেবকে আহ্বান জানাচ্ছি। আপনার জন্য সাতাশ দিনের সময়কাল এবং নগত সাতাশ রূপী পুরস্কার নির্ধারণ করা হয়েছে। আর আমি এ টাকা আপনাকে হস্তান্তর করতে আগ্রহী। আপনার চাওয়া সত্ত্বেও আমরা যদি না পাঠাই তাহলে আমরা মিথ্যাবাদী। আমরা পূর্বেই এ রূপী পাঠাতে পারি কিন্তু আপনি (এই মর্মে) আমার অঙ্গীকার ছাপিয়ে দিন , ‘আমি সাতাশ দিনের মধ্যে এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পুস্তিকা প্রকাশ করব।’ আপনি যদি এই সময় সীমার মধ্যে কোন পুস্তিকা প্রকাশ করেন তাহলে আপনি কেবল সাতাশ রূপীই পুরস্কার পাবেন না বরং আমরা সাধারণ্যে একথা ছাপিয়ে প্রচার করবোঃ আমরা এতকাল যাবৎ যে আপনাকে মৌলবী মুহাম্মদ হুসেইন বলি নি, কেবল ‘শেখ’ ‘শেখ’ বলে ডেকেছি আমাদের মারাত্মক ভুল ছিল। প্রকৃত আপনি বড় জ্ঞানী এবং সাহিত্যিক এবং আপনি এতই যোগ্য এক পণ্ডিত হাদীস সম্বন্ধে যাঁর ব্যাখ্যা সর্বজনবিদিত!!

দেখুন, এতে আপনার কত বড় বিজয় অর্জিত হচ্ছে! এরপর টাকা সংগ্রহ করার জন্য মানুষকে কষ্ট দেওয়া বা সেই চাকুরী থেকে পদতাগ করার আর কোন প্রয়োজন হবে না। কেননা, আপনি একবার যখন আমার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে দেখিয়ে দিবেন আমার ইলহামকে মিথ্যা সাব্যস্ত করেছেন বলে প্রতীয়মান হবে। এমতাবস্থায় আমার আর কিছুই অবশিষ্ট থাকলো বলে প্রমাণিত হবে। অতএব আপনাকে আমি খোদার তা’লার দোহাই দিচ্ছি! আপনি যদি আরবীর সামান্যতম জ্ঞানও রাখেন, এক তিল পরিমাণ জ্ঞানও যদি থেকে

এরপর ১৭-এর পাতায়.....

ঈমান যদি সপ্তর্ষি মণ্ডলে উঠে যায়, তবু সেই ঈমানকে পারস্য বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তি ফিরিয়ে আনবে।

রসূলের বাণী

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا اِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوْنَ○وَقَالُوْٓا ءَاٰلِهَتُنَا خَيْرٌ اَمْ هُوَ ؕ مَا ضَرَبُوْهُ لَكَ اِلَّا جَدَلًا ؕ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُوْنَ○اِنْ هُوَ اِلَّا عَبْدٌ اَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنٰهُ مَثَلًا لِّبَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ○وَلَوْ نَشَآءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَّلٰٓئِكَةً فِي الْاَرْضِ يَخْلُفُوْنَ○(سورۃ الزخرف: آیت 58-61)

অনুবাদ: এবং যখনই দৃষ্টান্ত স্বরূপ মরিয়মের পুত্রের উল্লেখ করা হয়, তো দেখ! তখনই তোমার জাতি ইহাতে হৈ চৈ আরম্ভ করে। এবং তাহারা বলেন, ‘আমাদের মা’বুদ শ্রেষ্ঠ, না সে?’ এবং তাহারা কেবল বাক-বিতণ্ডয়া স্বরূপই তোমাকে এই কথা বলে। বরং তাহারা বড়ই ঝগড়াটে জাতি।

সে (আমাদের) কেবল এক বান্দা ছিল, যাহাকে আমরা পুরস্কার দান করিয়াছিলাম এবং তাহাকে বনী ইসরাইলের জন্য দৃষ্টান্ত করিয়াছিলাম। এবং আমরা চাহিলে অবশ্যই তোমাদের মধ্য হইতে কতককে ফিরিশতা করিয়া দিতাম, যাহারা পৃথিবীতে (তোমাদের) স্থলাভিষিক্ত হইত। (সুরা যুখরুফ, আয়াত: ৫৮-৬১)

এই আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) বলেন:

১) অর্থাৎ কুরআন মজীদে ইবনে মরিয়মের পুনরাগমণের সংবাদ পাঠ করে তারা হৈ চৈ শুরু করে দেয়। তারা প্রশ্ন করে,‘সে কি আমাদের উপাস্য-র থেকে উত্তম ? কেননা আমাদের উপাস্যকে তো জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হয়। আর তাঁকেই কিনা জগতের সংশোধনের জন্য ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। অথচ দুটি ঘটনার মধ্যে যমীন আসমানের ফারাক আছে। মসীহ স্বয়ং নিজের বান্দেগী স্বীকার করছে আর তিনি পুণ্যবান ছিলেন, তাঁর তুলনা মুশরিক কিম্বা তাদের মুশরিকদের সর্দারদের সঙ্গে হতে পারে না।

২) ‘আমাদের উপাস্য’ বলতে সেই সব বুযুর্গদের বোঝানো হয়েছে, যাদেরকে তারা খোদার সমকক্ষে মহত্ব দেয়, তারা আক্ষরিক অর্থে তাদের সামনে সিজদাবনত না হলেও। যেমনটি বর্তমান যুগের মুশরিক, অর্থাৎ শিয়া সম্প্রদায়ের লোকেরা যে দাবি করে, মাহদীর আগমণ ঘটলে সমস্ত রসূলকে জীবিত করা হবে এবং তাঁর আনুগত্য করবে।

৩) অর্থাৎ মসীহর উপর ফিরিশতা অবতরণ করে। কেননা তিনি আধ্যাত্মিকভাবে ফিরিশতা হয়ে উঠেছিলেন। যদি মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগের মানুষ বা তাঁর পরবর্তী যুগের মানুষও মসীহ্র মত হয়ে যেত, তবে তাদের উপরও ফিরিশতা নাযেল হতে শুরু করত, এতে, আশ্চর্যের কিছু নেই। বর্তমানকালের মুসলমানরা কেবল হঠধর্মিতার কারণে এই সম্ভাবনাকে অস্বীকার করে।

(তফসীর সাগীর, পৃ: ৮১৬)

وَالنَّجْمِ اِذَا هَوٰى○مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى○

অনুবাদ: কসম নক্ষত্রটির যখন উহা নিপতিত হয়, তোমাদের সাথী পথভ্রষ্টও হয় নাই এবং বিভ্রান্তও হয় নাই।

(সূরা নজম, আয়অত:২-৩

এই আয়াতসমূহের ব্যাখ্যায় হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) বলেন:

১) এটি সেই ভবিষ্যদ্বাণীর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে, যা রসূল করীম (সা.) এই ভাষায় করেছিলেন।- لَوْ كَانَ الْاِيْمَانُ مُعَلَّقًا بِالثُّرَيَّا لَنَالَهٗ رَجُلٌ مِّنْ فَارِسَ অর্থাৎ ঈমান যদি সপ্তর্ষি মণ্ডলে উঠে যায়, তবু সেই ঈমানকে পারস্য বংশোদ্ভূত এক ব্যক্তি ফিরিয়ে আনবে।

২) অর্থাৎ তিনি যখন আবির্ভুত হবেন, তখন সকলের কাছে প্রকাশ হয়ে যাবে যে মহম্মদ রসুলুল্লাহ (সা.) এর শিক্ষা পরিপূর্ণ ছিল। তিনি পথভ্রষ্টও হন নি, বিভ্রান্তও হন নি।

(তফসীর সাগীর, পৃ: ৮৭৭)

হযরত নাফে বর্ণনা করেন যে, হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর (রা.) বলেছেন: একবার আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, এক রাতে আমি স্বপ্নে দেখি মক্কায় কাবার কাছে আছি। দেখলাম এক গোধুম বর্ণের সুদর্শন পুরুষকে, যার চুল কাঁধ পর্যন্ত নেমে এসেছে। চুলগুলো সোজা উজ্জ্বল, যার থেকে জলবিন্দু চুঁইয়ে পড়তে দেখা যাচ্ছে। সে দুই ব্যক্তির কাঁধে হাত রেখে বায়তুল্লাহ্র তোয়াফ করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, ‘এই ব্যক্তি কে?’ লোকেরা বলল, ‘মরীয়ম পুত্র ঈসা’। আমি তাঁর পিছনে আরও এক ব্যক্তিকে দেখলাম, যার চুল কোঁকড়ানো, রুক্ষ কঠিন চামড়া এবং দক্ষিণ চোখটি কানা, যার চেহারা ইবনে কুতানের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ আর সে এক ব্যক্তির দুই কাঁধে হাত রেখে কাবার তোয়াফ করছে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম,‘ এই ব্যক্তি কে?’ লোকেরা জানাল, মসীহ্র দাজ্জাল।’

(নোট: স্বপ্নে হুযুর (সা.)কে যে দৃশ্য দেখানো হয়েছিল, সেখানে কাবার তোয়াফ বলতে বোঝানো হয়েছে যে মসীহ্ বায়তুল্লাহ্র সুরক্ষা, মর্যাদাকে সমুন্নত করতে সচেষ্ট হবেন আর দাজ্জাল কাবার ক্ষতির উপক্রম করবে।)

(বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, হাদীস-৯৪৪, হাদীকাতুস সালেহীন থেকে উদ্ধৃত)

হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন, আঁহযরত (সা.) বলেছেন: নবীদের পারস্পরিক সম্পর্ক বৈমাতৃক ভাইয়েদের ন্যায়, যাদের পিতা এক, মা ভিন্ন ভিন্ন। মানুষদের মধ্যে আমার সব চেয়ে নৈকট্যের সম্পর্ক হল মরিয়ম পুত্র ঈসার সঙ্গে। কেননা আমার এবং তাঁর মাঝে কোন নবী নেই। .... তিনি আবির্ভুত হয়ে ক্রুশ ভঙ্গ করবেন। (অর্থাৎ ক্রুশীয় মতবাদকে খণ্ডন করে দেখাবেন) শূকর বধ করবেন (অর্থাৎ কুপ্রবৃত্তির মানুষদের ধ্বংসের কারণ হবেন। অতএব এর মাধ্যমে ক্রুশীয় আধিপত্যের অবসান ও কু-প্রবৃত্তির মানুষদের মূল উৎপাটন হবে) জিযিয়ার অবসান করবেন (অর্থাৎ সেই যুগটি হবে ধর্মীয় যুদ্ধের অবসানের যুগ) তাঁর যুগে আল্লাহ্ তা’লা ইসলাম ছাড়া সমস্ত ধর্মকে (আধ্যাত্মিকভাবেও এবং আধিপত্যের দিক থেকেও) উৎখাৎ করবেন এবং মিথ্যা দাজ্জালকে ধ্বংস করবেন। সেই যুগ এমন শান্তি ও নিরাপত্তার যুগ হবে যে, উট বাঘের সাথে, চিতা গরুর সাথে নেকড়ে ছাগলের সঙ্গে একত্রে চরে বেড়াবে। শিশু ও বৃদ্ধেরা সাপের সঙ্গে খেলা করবে। অতএব আল্লাহ্ তা’লার আদেশ অনুসারে, যতকাল তিনি চাইবেন মসীহ পৃথিবীতে থাকবেন। এরপর মৃত্যু বরণ করবেন, মুসলমানেরা তাঁর জানাযা পড়বে এবং তাঁর দফন ক্রিয়া সম্পন্ন করবে।

(আবু দাউদ, কিতাবুল মালাহিম, হাদীস-৯৪৫, হাদীকাতুস সালেহীন থেকে উদ্ধৃত)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, তোমাদের অবস্থা কেমন (দয়নীয়) হবে, যখন মরিয়ম পুত্র ঈসা অর্থাৎ রূপক ঈসা আবির্ভুত হবেন, যিনি তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের ইমাম হবেন। আরও একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে যে, তোমাদের মধ্য থেকে হওয়ার কারণে তোমাদের ইমামতির দায়িত্ব পালন করবেন।

(বুখারী, কিতাবুল আম্বিয়া, হাদীস-৯৪৭, হাদীকাতুস সালেহীন থেকে উদ্ধৃত)

হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: সকল বিষয় চরম আকার ধারণ করবে। পৃথিবীতে পশ্চাদগামীতা ছেয়ে যাবে, মানুষ কৃপণ হয়ে পড়বে। দুষ্ট লোকেরা কিয়ামতের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করবে। এমন ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আল্লাহ্ তা’লার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের আবির্ভাব ঘটবে। ঈসা ভিন্ন কোন মাহদী নেই। (অর্থাৎ ঈসাই মাহদী হবেন কেননা মাহদী ভিন্ন কোন অস্তিত্ব নেই)

(ইবনে মাজা, বাব শিদ্দাতুয যামান, হাদীস-৯৫৪, হাদীকাতুস সালেহীন থেকে উদ্ধৃত)

*****❖*****❖*****❖*****

যদি কোন ব্যক্তি কুরআনের শিক্ষায় একটি বিন্দুর সহস্র ভাগের এক ভাগ পরিমাণ ত্রুটি দেখাতে পারে বা পক্ষান্তরে কুরআনী শিক্ষার মোকাবিলায় এর চেয়ে উত্তম স্বীয় কোন গ্রন্থের এমন কোন শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারে তাহলে আমরা মৃত্যুদণ্ড গ্রহণে প্রস্তুত রয়েছি।

হযরত মসীহ মওউদ আলাইহিস সালাম এর বাণী

কুরআনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা আজ পর্যন্ত কেউ করতে পারে নি।

এ কারণেই কুরআনের প্রতিদ্বন্দ্বিতায়, সকল অবিশ্বাসী বাগ্মিতা ও বাকপটুতার দাবি এবং কবি-সম্রাট আখ্যায়িত হওয়া সত্ত্বেও মুখ বন্ধ করে বসে থাকে এবং এখনও নীরব ও নির্বাক হয়ে আছে আর এই নীরবতাই তাদের অক্ষমতা বা ব্যর্থতার সাক্ষ্য দিচ্ছে। প্রতিদ্বন্দ্বীর যুক্তি শুনে ও বুঝে যদি তা খণ্ডন করে না দেখানো হয় একেই দুর্বলতা বলা হয়, তা না হলে অক্ষমতা বা ব্যর্থতা আর কাকে বলে?

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ১৫২)

কুরআনের তিনটি বৈশিষ্ট্য

কুরআনের তিনটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত যে ধর্মীয় জ্ঞান মানুষের স্মৃতি থেকে হারিয়ে গিয়েছিল তার প্রতি পথনির্দেশ করে। দ্বিতীয়ত জ্ঞানের যেসব দিক প্রথমে কিছুটা সংক্ষিপ্ত রূপে চলে আসছিল, তা বিশদরূপে বর্ণনা করে। তৃতীয়ত যে সকল বিষয়ে মতভেদ ও বিতণ্ডা দেখা দিয়েছিল, সেসব ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দিয়ে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য প্রকাশ করে।

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ২২৫)

এমন কোন সত্য উপস্থাপন কর যা কুরআনে নেই

আপনারা যদি কোন বড় মানের প্রমাণ নিয়ে বসে থাকেন, যা সম্পর্কে আপনাদের ধারণা হলো, আপনারা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সুগভীর গবেষণা করে তা সৃষ্টি করেছেন আর তোমাদের মিথ্যা ধারণা অনুসারে কুরআন শরীফ সেই সত্য উপস্থাপনে ব্যর্থ ! তাহলে দোহাই! সকল ব্যাবসা বাণিজ্য পরিহার করে সেই সত্য আমাদের সামনে উপস্থাপন কর যেন আমরা কুরআন শরীফ থেকে তা বের করে তোমাদেরকে দেখাতে পারি। কিন্তু এমন ক্ষেত্রে তোমাদের মুসলমান হওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। যদি এখনও আপনারা কুধারণা পোষণ ও বাগাড়ম্বর পরিহার না করেন আর ধর্মীয় বিতর্কের সঠিক পন্থা অনুসরণ না করেন, তাহলে এছাড়া আর কী বলব যে, লা'নাতুল্লাহে আলাল কাযেবীন।

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ২২৫)

ফুরকানে মজীদ সকল যুগে নিজেই স্বীয় জ্যোতি প্রকাশ করেছে

মহানবী (সা.) যদি না আসতেন, কুরআন যদি অবতীর্ণ না হতো, যার প্রভাব ও কার্যকারিতা আমাদের নেতৃস্থানীয় ও জ্যেষ্ঠরা শুরু থেকে দেখে আসছেন আর আজ আমরা দেখছি, তাহলে কেবল বাইবেল দেখে নিশ্চিতরূপে শনাক্ত করা আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যেতো যে হযরত মূসা, হযরত ঈসা ও অতীতের অপরাপর নবীরা (আ.) সত্যিকার অর্থে সেই পূত পবিত্র জামা'তের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে খোদা স্বীয় বিশেষ স্নেহের পরশে আপন রিসালতের জন্য বেছে নিয়েছেন। আমাদের প্রতি কুরআনের এই অনুগ্রহ স্বীকার করা উচিত, যা সকল যুগে নিজেই স্বীয় জ্যোতি প্রকাশ করেছে আর সেই পূর্ণ জ্যোতির মাধ্যমে অতীতের নবীদের সত্যতাও আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। আর এই অনুগ্রহ শুধুআমাদের প্রতি নয়, বরং আদম থেকে আরম্ভ করে হযরত ঈসা পর্যন্ত সব নবীর প্রতি হয়েছে, যারা কুরআনের পূর্বে অতিবাহিত হয়েছেন। আর সব রসূল সেই মহান সত্তার অনুগ্রহের কাছে ঋণী, যাকে খোদা সেই উৎকৃষ্ট ও পবিত্র গ্রন্থ দিয়েছেন, যার পরমোৎকর্ষ প্রভাবের কল্যাণে সব সত্য চিরতরে অমর হয়ে গেছে এবং যার মাধ্যমে সেসব নবীর নবুয়্যতে বিশ্বাস স্থাপনের একটি পথ উন্মোচিত হয় আর তাদের নবুয়্যত সন্দেহ ও সংশয় থেকে মুক্ত থাকে।

দু'ধরনের নিদর্শন পবিত্র কুরআনের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য

জানা থাকা উচিত যে, দু'ধরনের নিদর্শন পবিত্র কুরআনের স্থায়ী বৈশিষ্ট্য। একটি হল, কুরআনের ভাষার নিদর্শন আর দ্বিতীয়টি হল, কুরআনের ভাষার প্রভাব বা কার্যকারিতার নিদর্শন। এই উভয় প্রকার নিদর্শন এত স্পষ্ট যে, যদি কারো হৃদয় বাহ্যিক অথবা রূপক ভ্রুক্ষেপহীনতার কারণে পর্দাবৃত না থাকে, তাহলে সে তাৎক্ষণিকভাবে সত্যের এই জ্যোতিকে স্বচক্ষে দেখতে পাবে। .কুরআনের ভাষা যে নিদর্শনমূলক, এই পুরো গ্রন্থ এর বর্ণনায় পরিপূর্ণ। কুরআনের ভাষার প্রভাব ও কার্যকারিতার নিদর্শন সম্পর্কে আমাদের কাছে এই প্রমাণও রয়েছে যে, আজ পর্যন্ত এমন কোন শতাব্দী অতিবাহিত হয় নি, যাতে খোদা তা'লা সোচ্চার ও সত্যান্বেষীদেরকে কুরআনের পূর্ণ অনুসরণের ফলে উৎকৃষ্ট আলো পর্যন্ত পোঁছান নি। সন্ধানীদের জন্য এখনও এই জ্যোতির অতি প্রশস্ত দ্বার উন্মোচিত রয়েছে, কেবল অতীতের কোন শতাব্দীর বরাতে কথা বললেই চলে না। সত্য ধর্ম ও ঐশী গ্রন্থের সত্যিকার অনুসারীদের ভেতর আধ্যাত্মিক কল্যাণরাজি থাকা বাঞ্ছনীয়, বিশেষ ঐশী রহস্যাবলী ভিত্তিক এলহামের অভিজ্ঞতা থাকা উচিত আর এসব কল্যাণরাজি আজও সন্ধানীদের লাভ হওয়া সম্ভব। কারো দেখার ইচ্ছা থাকলে নিষ্ঠার সাথে এদিকে আসা উচিত আর তা দেখে নিজের পরিণাম শুভ করা উচিত।

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৯০)

কুরআন থেকে কোন ত্রুটি বের করে দেখাও!

যদি কোন ব্যক্তি কুরআনের শিক্ষায় একটি বিন্দুর সহস্র ভাগের এক ভাগ পরিমাণ ত্রুটি দেখাতে পারে বা পক্ষান্তরে কুরআনী শিক্ষার মোকাবিলায় এর চেয়ে উত্তম স্বীয় কোন গ্রন্থের এমন কোন শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে পারে তাহলে আমরা মৃত্যুদণ্ড গ্রহণে প্রস্তুত রয়েছি। হে সুবিচারকগণ! এখন চিন্তা কর আর খোদার খাতিরে হৃদয় পরিষ্কার করে চিন্তা কর যে, আমাদের বিরোধীদের বিশ্বাস ও খোদাভীতি কোন পর্যায়ের! নির্বাক হওয়া সত্ত্বেও তারা অপলাপ থেকে বিরত হয় না।

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ২৯৮)

সকল সত্য ইঞ্জিলে নেই

স্মরণ রাখা উচিত, ইঞ্জিলের শিক্ষাকে উৎকৃষ্ট মনে করা বুদ্ধির অভাব ও বোঝার ভুল। স্বয়ং হযরত ঈসা (আ.) ইঞ্জিলের শিক্ষাকে ত্রুটিমুক্ত মনে করেন নি। যেমন, তিনি নিজে বলেছেন, তোমাদের উদ্দেশ্যে আমার আরো অনেক কিছু বলার আছে, কিন্তু তোমরা এখন তা সহ্য করতে পারবে না। অবশ্য যখন তিনি অর্থাৎ সত্যের আত্মা আসবেন তিনি তোমাদের সত্যের সকল পথ সম্পর্কে অবহিত করবেন। (যোহন: ১৬, আয়াত: ১২-১৬)। এখন বলুন! এটিই কি ইঞ্জিল যা সকল ধর্মীয় সত্য নিজের মাঝে ধারণ করে যার বর্তমানে কুরআনের কোন প্রয়োজন নেই।

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩০০)

ঐশী তত্ত্বের উপকরণ কুরআন শরীফে আছে, ইঞ্জিলে নেই

কিন্তু হযরত ঈসার অনুসারী আখ্যায়িত হয়ে আবার সে বিষয়কে কামেল আখ্যা দেবেন যাকে হযরত ঈসা আপনাদের ১৮২০ বছর পূর্বে অসম্পূর্ণ আখ্যা দিয়েছেন! আর যদি আপনাদের ঈসার সত্তায় বিশ্বাসই না থাকে আর নিজেরাই ইঞ্জিলের সাথে কুরআনের তুলনা করতে চান, তাহলে আসুন আর ইঞ্জিল হতে সেসব পরম শিক্ষামালা বের করে দেখান যা আমরা এ গ্রন্থে কুরআন শরীফ সম্পর্কে প্রমাণ করেছি যেন ন্যায়পরায়ণ মানুষ নিজেই দেখে নিতে পারেন যে, ঐশী তত্ত্বের উপকরণ কুরআন শরীফে আছে, নাকি ইঞ্জিলে?

(বারাহীনে আহমদীয়া, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩০১)

অতীতের বুযুর্গদের ভবিষ্যদ্বাণীর আলোকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতা

–মামুন রশীদ তাবরেয, মুরুব্বী সিলসিলা, আহমদীয়াতের ইতিহাস বিভাগ, কাদিয়ান।

পৃথিবীতে যখনই কোনও প্রতিশ্রুত নবী বা রসূল এসেছেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের আবির্ভাবের সংবাদ পূর্বেই তাঁর পুণ্যবান বান্দাদের মাধ্যমে দিয়ে রেখেছেন। এই সংবাদগুলি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যভাজন আওলিয়াগণ অনাগত প্রজন্মের জন্য ভবিষ্যদ্বাণী হিসেবে সংরক্ষিত রেখে যান। সেই সব ভবিষ্যদ্বাণীতে প্রতিশ্রুত নবীর আগমণের নির্দিষ্ট সময়কাল ও স্থানও বর্ণিত থাকে। এছাড়াও ভবিষ্যদ্বাণীসমূহে প্রতিশ্রুত যুগের নিদর্শন ও বৈশিষ্টাবলীরও উল্লেখ থাকে। বাইবেলের বিভিন্ন স্থানে হযরত ঈসা (আ.)-এর সম্পর্কেও আর আমাদের প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ মুস্তাফা (সা.)-এর সম্পর্কে বানী ইসরাঈলী নবীগণের ভবিষ্যদ্বাণী পাওয়া যায়। রসুল আকরম (সা.) তাঁর উম্মতের উলেমাদের সম্পর্কে বলেছেন–

عُلَمَاءُ اُمَّتِیْ کَاَنْبِیَاءِ بَنِیْ اِسْرَائِیْلَ

অর্থাৎ আমার উম্মতের
উলেমারা বনী ইসরাইল
জাতির নবীগণ সদৃশ হবেন।

রসূলুল্লাহ্ (সা.) এর উম্মতে যে বুযুর্গ ও আওলিয়াগণ গত হয়েছেন, তাঁরা আগমণকারী প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী সম্পর্কে তাঁর আবির্ভাবের পূর্বেই বানী ইসরাঈলী আম্বিয়াদের ন্যায় ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। এগুলি ছিল সেই সব ভবিষ্যদ্বাণী যা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)-এর আবির্ভাবের ফলে দিবালোকের ন্যায় স্পষ্টরূপে পূর্ণ হয়েছে আর তাঁর সত্যতার উপর নিদর্শন প্রমাণিত হয়েছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন–

'মুসলমানদের মধ্যে অনেকে কাশফ-দ্রষ্টা আছেন, যাদের সংখ্যা হাজারের অধিক হবে, তাঁরা নিজেদের দিব্যদর্শন এবং খোদা তা'লার সঙ্গে বার্তালাপের উপর নির্ভর করে তাঁরা একবাক্যে জানিয়ে গেছেন যে, প্রতিশ্রুত মসীহ্র আবির্ভাবকাল চতুর্দশ শতাব্দী অতিক্রম করবে না। কাশফদ্রষ্টাদের এই বিরাট গোত্র, যারা কিনা পূর্বের ও পশ্চাতের সমষ্টি, তাদের সকলের মিথ্যাবাদী হওয়া এবং তাদের সকল অনুমানও মিথ্যা হওয়া মোটেই সম্ভব নয়। ”

(তোহফায়ে গোল্ডবিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ: ৩২৬)

১- সেই সব পুণ্যবান বুযুর্গদের মধ্যে একজন হলেন আল্লামা আব্দুল ওয়াহাব আশোয়ারানী (রাহে.) (মৃত্যু-৯৭৬ হিজরী) তাঁর রচিত পুস্তক 'আল ইউয়াকিতু ওয়াল জোয়াহির' পুস্তকে লেখেন–

مَوْلِدُهٗ لَیْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ
سَنَةَ خَمْسِیْنَ وَ مِئَتَیْنِ بَعْدَ الْاَلْفِ

' অর্থাৎ ইমাম মাহদী (আ.) এর জন্ম হবে ১২৫০ হিজরী সনে।

(নুরুল আবসার ফি মানাকিব আলে বায়তেন নাবী আল মুখতার)

২- দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ হযরত শাহ ওলীউল্লাহ্ মুহাদ্দিস দেহেলবী (রাহে.) কে স্বয়ং খোদা তা'লা জ্ঞাত করেছিলেন যে, ‘‘اَلْمَهْدِیُّ تَهَیَّاَ لِلْخُرُوْجِ’’ অর্থাৎ ইমাম মাহদী আসার জন্য প্রস্তুত।

(তাফহীমাতে ইলাহিয়া, ২য় খণ্ড, পৃ: ১২৩)

নওয়াব সিদ্দীক হাসান খান সাহেব তাঁর রচিত হুজ্জাতুল কেরামা ফি আসারিল কিয়ামাহ' গ্রন্থের ৩৯৪ পৃষ্ঠায় ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের সময় সম্পর্কে লেখেন–

হযরত শাহ ওলী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহেলবী ইমাম মাহদী (আ.)-এর আবির্ভাবের তারিখ 'চিরাগ দ্বীন ' শব্দের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন যা 'হুরুফে আবজাদ' হিসেবে ১২৬৮ দাঁড়ায়।

২- দিল্লী সংলগ্ন একটি এলাকায় প্রায় আটশ বছর পূর্বে হযরত নেয়ামোতুল্লাহ শাহ ওলীউল্লাহ্ (রাহে.) নামে এক কাশফ-দ্রষ্টা ও এক সিদ্ধ পুরুষ ছিলেন। তাঁর প্রখ্যাত ফার্সি কাসিদায় শেষ যুগের পরিস্থিতির উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি লেখেন–

'মেহেদীয়ে ওয়াক্ত ও ঈসা দোওরাঁ, হার দোওরা শাহসোওয়া মে বিনাম

অর্থাৎ সেই যুগের মাহদী ও ঈসাকে আমি অশ্বারোহী হিসেবে দেখছি।

(আরবাঈন ফি আহওয়ালুল মাহদীইয়ান)

৪- হযরত শেখ মহীউদ্দীন ইবনে আরাবী (রাহে.) (মৃত্যু: ৬৩৮ হিজরী) ৬২৮ হিজরীতে বলেন:

‘‘وَیَکُوْنُ ظُهُوْرُهٗ بَعْدَ مَضِیِّ خ ف ج مِنَ الْهِجْرَةِ’’

অর্থাৎ ইমাম মাহদীর আবির্ভাব হবে হিজরী সন মোতাবেক 'খে ফে জীম' অতিক্রান্ত হওয়ার পর।

(মুকাদ্দমা ইবনে খালদুন, পৃ: ৩৫৪)

হুরুফে আবজাদ মান অনুসারে খে, ফে এবং জীমের সংখ্যা মান দাঁড়ায় ৬৮৩। (খে-৬০০, ফে-৮০, জীম-৩)। তাঁর এই বয়ানটি ৬২৮ হিজরীর। ৬২৮ এর সঙ্গে ৬৮৩ যোগ করলে দাঁড়ায় ১৩১১ সন যা ইমাম মাহদীর নিদর্শন সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণের বছর।

৫- বহু প্রখ্যাত ভাষণদাতা এবং বইপুস্তকের রচয়িতা শেখ আলি আসগার বুরু জার্দী নামে এক ইরানী বুযুর্গ তাঁর পুস্তক নুরুল আনোয়ার পুস্তকের ২১৫ পৃষ্ঠায় লেখেন–

অনুবাদ: 'সারগী' বছরে যদি তুমি জীবিত থাক, তবে সাম্রাজ্য ও জাতি ও ধর্মের জগতে বিপ্লব সাধিত হবে। হুরুফে আবজাদ অনুসারে 'সারগি'র সংখ্যামান দাঁড়ায় ১২৯০।

(ইমাম মাহদী কা জাহুর, রচনা- মহম্মদ আসাদুল্লাহ কাশ্মীরি, পৃ: ৪১৭)

৬- আরব দেশসমূহের পরিভ্রমণ করার সময় সেখানকার উলেমাদেরকে ইমাম মাহদীর জন্য অপেক্ষা করতে দেখে খোওয়াজা হাসান নিজামী লেখেন–

কি অদ্ভুত বিষয়, এটি সেই সময় যখন কিনা ১৩৩০ সনেই সানোসির সংবাদ অনুসারে হযরত ইমাম মাহদীর আবির্ভাবের কথা, আর এটি যদি সেই সময় না হয়, তবে ৪০ হিজরী সন পর্যন্ত হওয়া নিশ্চিত। কেননা একাধিক বুযুর্গের ভবিষ্যদ্বাণীকে একসঙ্গে রেখে দেখলে ৪০ হিজরী পর্যন্ত সকলেই এ বিষয়ে একমত।

(শেখ সানোসী এবং জাহুরে ইমাম মাহদীয়ে আখের যামান)

যুগ খলীফার বাণী

আল্লাহ্র সামনে নতজানু হওয়াই হল বিপদাপদপূর্ণ অবস্থা থেকে পরিত্রাণের একমাত্র পথ। (খুতবা জুমা প্রদত্ত,১০ই মার্চ, ২০১৭)

দোয়াপ্রার্থী: **Qazi Badruddin Sb. (Neogirhat, West Bengal)**

৭- হযরত হাফিয বারখুরদার খান আলাইহি রাহমাহ নামে সিয়ালকোটের এক কামেল বুযুর্গ ছিলেন। তিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর আগমণ সম্পর্কে বলেন-

যখন হিজরী সনের পুরো ত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবে, তখন হযরত ঈসার আবির্ভাব হবে। এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, হযরত হাফিজ বারখুরদার সাহেব ঈসা (আ.)-এর আবির্ভাবে বিশ্বাসী, আকাশ থেকে অবতরণে বিশ্বাসী নয়।

৮- এক প্রখ্যাত শিয়া বুযুর্গ হযরত আবু সাঈদ খানাম হিন্দী কাশফ বা দিব্যদর্শনে হযরত ইমাম মাহদী (আ.)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন। তিনি নিজের পুরো কাশফ বর্ণনা করার পর শেষে বলেন,

“كُلُّ ذٰلِكَ بِكَلَامِ الْهِنْدِ”

“অর্থাৎ কাশফ এ আমি হযরত ইমাম মাহদী যে ভাষায় কথা বলেছেন, তা ছিল ভারতীয় ভাষা।’

(ইমাম মাহদী কা যাহুর, পৃ: ৩৬৩)

যদিও হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর মাতৃভাষা পাঞ্জাবী ছিল, কিন্তু এর দ্বারা ভারতের ভাষার প্রতি নির্দেশ করা করা হয়েছে। তাঁর অধিকাংশ পুস্তক এই ভাষাতেই রয়েছে।

৯- আরও একজন সুফি বুযুর্গ হযরত শেষ হাসান আল ইরাকি তাঁর পুস্তক গায়াতুল মাকসুদ - এ লেখেন-

‘আমি তোমাদেরকে একটি কথা বলছি--- আমি যখন সিরিয়ায় যুবক অবস্থায় জামি বানি উমাইয়ায় প্রবেশ করলাম, তখন আমি এক ব্যক্তিকে চেয়ারে বসে মাহদী ও তাঁর আবির্ভাব সম্পর্কে কথা বলতে শুনেছিলাম। সেই সময় থেকে আমার মনে ইমাম মাহদীর ভালবাসা প্রোথিত হয়ে আছে। আর আমি দোয়া করতে শুরু করি যে, আল্লাহ্ যেন আমাকে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করিয়ে দেন। আমি এক বছর পর্যন্ত দোয়া করতে থাকি। এক দিন মগরিবের পর মসজিদেই ছিলাম, হঠাৎ করে এক ব্যক্তি আমার কাছে উপস্থিত হল, যাঁর পরিধানে ছিল অনারবদের ন্যায় পাগড়ি আর উটের পশমের ‘জুব্বা’। তিনি আমার কাঁধখানি নিজের হাত দিয়ে স্পর্শ করে আমাকে বললেন, ‘আমার সঙ্গে সাক্ষাতের তোমার কিসের প্রয়োজন?’ আমি বললাম, আপনি কে? তিনি উত্তর দিলেন, ‘আমি ইমাম মাহদী।’ অতঃপর আমি তাঁর হাত চুম্বন করলাম। ”

(গায়াতুল মাকসুদ, ২য় খণ্ড, পৃ: ৮১)

এই বর্ণনায় সংবাদ দেওয়া হয়েছে যে যুগের প্রতিশ্রুত সেই ইমাম অনারব হবেন। এই উদ্ধৃতিটিকে পূর্বের উদ্ধৃতির সঙ্গে মিলিয়ে দেখলে বুঝতে পারবেন যে, প্রতিশ্রুত ইমাম যে ভারতে আবির্ভুত হবেন, এখানে সে সম্পর্কেই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে।

১০- হযরত মহীউদ্দিন ইবনে আরাবী (রহ.) ‘ফুসুসুল হাকাম’ নামে একটি পুস্তক রচনা করেছিলেন। কথিত আছে যে সেই পুস্তকটি কিনা একটি সত্য স্বপ্নে হযরত রসূল করীম (সা.)-এর নির্দেশে তিনি রচনা করেছিলেন। উক্ত পুস্তকে ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে, প্রতিশ্রুত আগমণকারী যিনি ‘খাতামুল আওলিয়াও’ বটে, তিনি জমজ হিসেবে জন্মগ্রহণ করবেন। তাঁর পূর্বে এক কন্যা সন্তানের জন্ম হবে এবং পরে তিনি জন্ম নিবেন।

ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে যে, প্রতিশ্রুত আগমণকারী ‘খাতামুল আওলাদ’ হবেন। ‘খাতামুল আওলাদ’ এর অর্থ খাতামুল আওলিয়া। দ্বিতীয় তিনি জমজ হিসেবে জন্ম গ্রহণ করবেন। এর পূর্বে তাঁর বোন জন্ম নিবে এবং তাঁর জন্মস্থান হবে চীন। আরবীতে ‘আস্‌সীন’ শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আরবীতে উক্ত শব্দ আরবের বহির্জগত বা দূর দূরান্তের কোনও এলাকার জন্য ব্যবহৃতহয়। এখানেও বোঝানো হয়েছে যে প্রতিশ্রুত নবী মসীহ ও মাহদীর জন্মস্থান আরবের বাইরে কিম্বা দূরদূরান্তের কোনও এলাকায় হবে।

(ফুসুসুল হাকাম, পৃ: ৩৬, অনুবাদ: মৌলানা মহম্মদ মুবারক আলি হায়দ্রাবাদী)

হযরত মহীউদ্দিন ইবনে আরবী (রহ.) এর আরও একটি রচনা ‘ফাতুহাতি মাক্কিয়া’-র তৃতীয় খণ্ডে প্রতিশ্রুত আগমণকারীর সাহাবা এবং নিকটভাজনদের উল্লেখ করা হয়েছে। পুস্তকে লেখা আছে-

“তাঁরা সকলে অনারব হবেন, তাঁদের কেউই আরব বংশোদ্ভুত হবেন না। কিন্তু তাঁরা আরবীতে কথা বলবেন। তাঁদের মধ্যে একজন কুরআনের হাফিজ হবেন, যিনি তাঁদের সমগোত্রের হবেন না, কেননা তিনি কখনও খোদা তা’লার অবাধ্য হবেন না। তিনি সেই প্রতিশ্রুত মহাপুরুষের বিশেষ উজির ও বিশ্বস্ত সৈনিক হবেন।”

(ফুতুহাতি মাক্কিয়া, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩৬৪-৩৬৫)

সুবহানাল্লাহ! এই ভবিষ্যদ্বাণীতে একদিকে যেমন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর উল্লেখ রয়েছে, তেমনি হযরত হাকীমুল উম্মত মৌলানা নুরুদ্দীন সাহেব খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)-এর প্রতি স্পষ্ট ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১১) মুলতানের এক প্রখ্যাত ওলী ও কামিল বুযুর্গ হযরত শেখ মহম্মদ আব্দুল আযীয পাহারবী (রহ.) আল্লাহ্ তা’লার পক্ষ থেকে ইলহামের দ্বারা সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হওয়ার বিষয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন। তাঁর সেই ফার্সি স্তবকটির অনুবাদ নিম্নরূপ:

‘১৩১১ হিজরতে সূর্য ও চন্দ্রকে একত্রে একমাসে গ্রহণ লাগবে। আর এই দুটি নিদর্শন সত্য মাহদী এবং মিথ্যা দাজ্জালের মধ্যে পার্থক্য নিরুপণকারী হবে।’ এই ভবিষ্যদ্বাণীতে বলা হয়েছে যে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ ১৩১১ হিজরীতে সংঘটিত হবে। নির্ভুলভাবে ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারেই, অর্থাৎ ১৮৯৪ সালে এই নিদর্শন প্রকাশিত হয়েছে।

এগুলি ছিল উম্মতের বুযুর্গদের সেই সকল মহান ভবিষ্যদ্বাণী যেগুলি যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব মসীহ ও মাহদীর সত্যতা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরে। আল্লাহ্ তা’লা পূর্ববর্তী সেই সকল বুযুর্গদের দ্বারা বর্ণিত সংবাদের ভিত্তিতে সমগ্র পৃথিবীর হৃদয় দুয়ার উন্মুক্ত করুন এবং জগতবাসী যেন হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর সত্যতা দলে দলে গ্রহণ করে। আমীন।

****

যুগ ইমামের বাণী

“দোয়া, সদকা ও দানের মাধ্যমে শাস্তি থেকে পরিত্রাণ লাভ এমন এক প্রমাণিত সত্য, যা এক লক্ষ চব্বিশ হাজার নবী দ্বারা স্বীকৃত।” (মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and family, Barisha (Kolkata)

যুগ ইমামের বাণী

তোমরা নিজেদের মনকে সরল করিয়া এবং জিহ্বা চক্ষু ও কর্ণকে পবিত্র করিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হও, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে গ্রহণ করিবেন। (কিশতিয়ে নূহ, পৃ: ২৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

ন্যায় বিচারক ও মীমাংসাকারী হিসেবে

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) -এর সত্যতা

–লাঈক আহমদ ডার, মুরুব্বী সিলসিলা, নাযারত উলিয়া, কদিয়ান।

ইতিহাস সাক্ষী আছে, আল্লাহ্ তা'লা যখনই পৃথিবীতে কোনও প্রত্যাদিষ্টকে প্রেরণ করেছেন, তাঁদের প্রবল বিরোধিতা হয়েছে। কারণ, যুগের ধারার বিপরীতে তাঁরা অন্য কিছু দাবি করেছেন এবং চিরাচরিত মতবাদ ছেড়ে ভিন্ন মতবাদের ঘোষণা দিয়েছেন। অতঃপর জনসাধারণের মধ্য থেকে পুণ্যবান প্রকৃতির মানুষেরদের কাছে তাঁদের সত্যতা উন্মোচিত হয়েছে এবং তাঁরা ঈমানের সম্পদে ধন্য হয়েছে এবং আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে প্রত্যাদিষ্ট পুরুষদের সত্যতা সূর্যের থেকেও বেশি উজ্জ্বল হয়ে তাদের কাছে প্রকাশ পেয়েছে। বিরুদ্ধবাদীদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে বলেন-

يٰحَسۡرَةً عَلَى الۡعِبَادِ مَا يَاۡتِيۡهِمۡ مِّنۡ رَّسُوۡلٍ
اِلَّا كَانُوۡا بِهٖ يَسۡتَهۡزِءُوۡنَ (سورة يٰسين:31)

অর্থাৎ, পরিতাপ! বান্দাগণের জন্য, তাহাদের নিকট এমন কোন রসূল আসে নাই, যাহার প্রতি তাহারা ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে নাই।

(সূরা ইয়াসিন:৩১)

অন্যদিকে ঐশী জামাতের বিজয় সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা বলেন-

كَتَبَ اللّٰهُ لَاَغۡلِبَنَّ اَنَا وَرُسُلِىۡ ؕ اِنَّ اللّٰهَ قَوِىٌّ عَزِيۡزٌ

আল্লাহ্ তা'লা নির্ধারিত করে রেখেছেন যে আমি এবং আমার রসূল বিজয়ী হব। নিশ্চয় আল্লাহ্ মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী।

(সূরা মুজাদিলা:২১)

হযরত রসূলে আকরম (সা.) মুসলমান জাতির অনাগত ভবিষ্যতের পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে তাদেরকে সাবধান করেছেন এবং শেষ যুগে এক প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের আগমণের ভবিষ্যদ্বাণীও করে বলেন, 'মুসলিম জাতিতে এক খাদিম আবির্ভূত হবে, যে পদমর্যাদায় মসীহ ও মাহদী এবং ন্যায়-বিচারক ও মীমাংসাকারী এবং নবীর সমতুল্য হবে এবং আরশ থেকে তাঁকে পরম সম্মানে আহ্বান করা হবে। তাঁকে আমার সালাম বলে দিও এবং তাঁর বয়আত করো। অর্থাৎ তাঁর বিরোধিতায় কোমর বেঁধে নেমে পড়ো না, বরং সেই জামাতে যোগদান করো।

যথাসময়ে এবং যুগের প্রয়োজন অনুসারে এই আসমানী বাদশাহ্র আগমণ ঘটল, যিনি দাবি করলেন, 'আমি প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী, ন্যায় বিচারক ও মীমাংসাকারী এবং নবী।' তাঁর এই দাবী শুনে সহসায় বিরোধিতা শুরু হল। এই ধারার পুনরাবৃত্তি তো অবধারিত ছিলই, কেননা পূর্বাহ্নেই ভবিষ্যদ্বাণী সমূহে বলা হয়েছিল যে, তাঁর বিরোধীতা হবে।

হাদীসে মসীহ ও মওউদ কে ন্যায় বিচারক ও মীমাংসাকারী আখ্যায়িত করে বিশেষভাবে বলা হয়েছিল যে, তিনি মতানৈক্যপূর্ণ সকল ধর্মীয় বিষয়ে ন্যায় বিচারক ও মীমাংসাকারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হবেন। কাজেই তিনি 'হাকাম' ও আদাল হিসেবে আবির্ভূত হয়েছেন এবং সকল মতানৈক্যপূর্ণ ধর্মীয় বিষয়ে নিজের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। যারা তাঁর কথা মেনে নিয়েছে, তাদেরকে তাঁর জামাত বলা হয় আর বাকিরা চিরন্তন ক্ষতির মুখে নিপতিত হয়েছে।

কতিপয় মতানৈক্যপূর্ণ কিন্তু ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে হাকাম ও আদাল হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন সেগুলির বিবরণ সংক্ষেপে দেওয়া হল।

হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃত্যু।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) বলেন-

"পঞ্চম ভুলটি ছিল হযরত মসীহ (আ.)-এর ক্রুশের ঘটনা সংক্রান্ত। যে বিষয়ে মুসলমান ও ইহুদী উভয় জাতিই ভ্রান্তিতে নিপতিত ছিল। মুসলমানেরা বলত, ইহুদীরা হযরত মসীহ্র পরিবর্তে অন্য কোন ব্যক্তিকে ক্রুশে দিয়েছিল এবং খোদা তাঁকে আকাশে তুলে নিয়েছেন। ইহুদী এবং খৃষ্টানরা বলত, হযরত মসীহকেই ক্রুশে দিয়ে হত্যা করা হয়েছিল। মুসলমানদের ধারণাকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এভাবে রদ করেছেন যে, তিনি বলেছেন-

হযরত মসীহ্র পরিবর্তে অন্য কাউকে ক্রুশে দেওয়া স্পষ্ট অন্যায় ছিল। যদি সেই ব্যক্তির ইচ্ছেয় তাকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল, তবে সে বিষয়ের প্রমাণ ইতিহাসে থাকা উচিত। এছাড়া যদি মসীহকে খোদার আকাশে তুলে নেওয়ার পরিকল্পনা ছিল, তবে অন্য কোনও বেচারাকে ক্রুশে দেওয়ার প্রয়োজনই বা কি ছিল? কাজেই একথা ভুল যে, মসীহর পরিবর্তে অন্য কাউকে ক্রুশে দেওয়া হয়েছিল। আর এটাও ভুল যে তাঁকে আকাশে তুলে নেওয়া হয়েছিল। অপরদিকে ইহুদী ও খৃষ্টানরা যে বিশ্বাস করে যে ক্রুশেই মসীহ্র মৃত্যু হয়েছিল, সেই বিশ্বাস তিনি ভেঙ্গে দেন এবং প্রমাণ করেন যে , হযরত মসীহকে ক্রুশ থেকে জীবিত নামিয়ে আনা হয়েছিল আর এভাবে খোদা তা'লা তাঁকে অভিশপ্ত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন।

এখন দেখুন, উনিশ শ' বছর পর হযরত মসীহ মওউদ (আ.) দ্বারা এই ঘটনার সত্য উদ্ঘাটন করা কত বড় কাজ ছিল! বিশেষ করে আমরা যখন দেখি, তিনি ইঞ্জিল থেকেই প্রমাণ করেছেন যে হযরত মসীহ ক্রুশ থেকে জীবিত নেমে এসেছিলেন । যেমন হযরত মসীহ্র কাছে একবার সে যুগের উলেমারা নিদর্শন চেয়েছিল। তখন তিনি তাদেরকে উত্তর দিয়েছিলেন-

"এই যুগের দুরাচারী ও ব্যাভিচারীরা নিদর্শন দেখতে চায়, কিন্তু ইউনাহ (ইউনুস) নবীর নিদর্শন ছাড়া তাদেরকে আর কোনও নিদর্শন দেওয়া হবে না। কেননা যেভাবে ইউনাহ তিন দিন তিন রাত্রি মাছের পেটে ছিল, অনুরূপভাবে ইবনে আদম তিন রাত তিন দিন ভূগর্ভের অভ্যন্তরে থাকবে।"

(মতি, ১২ অধ্যায়, আয়াত: ৩৯-৪০)

তওরাত থেকে প্রমাণিত যে হযরত ইউনুস নবী তিন দিন পর্যন্ত মাছের পেটে জীবিত ছিলেন। অতঃপর তিনি জীবিত বের হয়ে আসেন। কাজেই হযরত মসীহ্ নাসেরীর জন্যও ক্রুশের ঘটনার সময় জীবিত কবরে যাওয়া এবং জীবিত ফিরে আসাই আবশ্যক ছিল। কাজেই হযরত মসীহ (আ.) ক্রুশে মারা গিয়েছিলেন এমন ধারণা ইঞ্জিলের বর্ণনার পরিপন্থী। আর এই ঘটনায় স্বয়ং মসীহ্র মিথ্যাবাদী প্রতিপন্ন হওয়া অনিবার্য হয়ে দাঁড়ায়। খৃষ্টবাদের উপর হযরত মসীহ মও্উদ (আ.) এর এটি এত বড় আক্রমণ ছিল যে, তাঁর কাজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার জন্য তা একাই যথেষ্ট। কিন্তু তিনি এতেই ক্ষান্ত

যুগ খলীফার বাণী

যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ সংগ্রাম না করে, দোয়া না করে, সে অন্তরকে ঘিরে রাখা অজ্ঞতার জমাট অন্ধকারকে দূর করতে পারে না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১৫)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

যুগ খলীফার বাণী

নিজেদের ব্যবহারিক নমুনার মাধ্যমে আশপাশের মানুষের সামনে ইসলামের অনিন্দ্য সুন্দর শিক্ষা তুলে ধরতে হবে।

(বেলজিয়াম জলসার সমাপনী ভাষণ, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

হন নি, বরং ইতিহাস থেকে প্রমাণ করেছেন যে, হযরত মসীহ নাসেরী (আ.) ক্রুশের ঘটনার পর কাশ্মীরে এসেছেন এবং সেখানেই মৃত্যু বরণ করেছেন। অর্থাৎ তাঁর সমগ্র জীবনকে অন্তরাল থেকে প্রকাশ্যে বের করে এনেছেন।

(হযরত মসীহ মওউদ কে কারনামে, আনোয়ারুল উলুম, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১৭০-১৭১)

খাতমে নবুয়ত

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ. (রা.) বলেন:

“এছাড়াও নবুয়্যতের ধারা নিয়ে এই মতভেদ ছিল যে আঁ হযরত (সা.)এর মাধ্যমে যাবতীয় প্রকারের নবুয়্যতের সমাপ্তি ঘটেছে; এখন কোনও ব্যক্তি তাঁর কল্যাণে সিক্ত হয়ে তাঁরই শরীয়তের সেবক হলেও নবী হতে পারবে না। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যুক্তি ও দলিল দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, ‘খাতামান্নাবীঈনের অর্থ তা নয় যা এতদিন ধারণা করা হত। আর নবুয়্যতের ধারা বন্ধ হয়ে যাওয়ার অর্থ এই যে এখন কোন প্রকার নবী আসতে পারে না। কেননা আঁ হযরত (সা.)-এর পর কেবল শরীয়তধারী নবীর পথ বন্ধ হয়েছে, কিন্তু শরিয়তবিহীন ও ছায়া নবীর পথ বন্ধ হয় নি। যদি নবুয়তের সমস্ত প্রকার বন্ধ ও ব্যহত হয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়, তবে এর অর্থ এই দাঁড়াবে যে আঁ হযরত (সা.) উম্মতে মুহাম্মাদীয়ার কাছ থেকে এক বিরাট ঐশী আশিস ও কৃপা ছিনিয়ে নিয়েছেন। নাউযুবিল্লাহ। মোটকথা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যৌক্তিক ও শাস্ত্রীয় দলিল দ্বারা এই ধারণাটিকে অলীক প্রতিপন্ন করেছেন। (হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর রচনা ‘এক গালতী কা ইযালা’, তোহফা গোল্ডবিয়া, নুযুলুল মসীহ এবং হাকীকাতুল ওহী দ্রষ্টব্য)”।

কুরআন ও হাদীসের মর্যাদা

কমরুল আম্বিয়া হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ. (রা.) বলেন:

“এছাড়া কুরআন ও হাদীসের মর্যাদা সম্পর্কে অর্থাৎ এই দুইয়ের মধ্যে কে অপরের বিষয়ে বিচারক? এ সম্পর্কে এমন চিন্তাধারা প্রকাশ করা হয়েছে যা শুনে একজন মুসলমান আঁতকে ওঠে। মুসলমানদের মধ্যে একটি ফির্কা কুরআনকে পেছনে ফেলে রেখেছিল এবং হাদীসের সামনে সেজদাবনত হয়ে পড়েছিল যেভাবে প্রতিমার সামনে পৌত্তলিক সেজদা করে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই সব বিষয় নিয়ে অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও তাত্ত্বিক আলোচনা করেন। একদিকে তিনি প্রমাণ করেন যে সুন্নত ও হাদীস ভিন্ন ভিন্ন বিষয়। অপরদিকে তিনি যুক্তি ও দলিল দ্বারা কুরআন, সুন্নত ও হাদীসের ভিন্ন মর্যাদা নির্ধারণ করেন। (আল হক লুধিয়ানা, চাকডালবির মোবাহাসার রিভিউ এবং কিশতিয়ে নূহ দ্রষ্টব্য)

(তবলীগে হিদায়াত, পৃ: ১১০)

কুরআন ও হাদীস সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) বলেন-

“১৩ নম্বর ভুল মানুষ যেটি করছিল সেটা হল, তারা মনে করত কুরআন করীম হাদীসের অধীন। এমনকি তারা এতদূর পর্যন্ত বলত যে হাদীস কুরআন করীমের আয়াত রহিত করার ক্ষমতা রাখে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এই ত্রুটিটিকে রদ করতে গিয়ে বলেছেন, কুরআন করীম বিচারক আর হাদীস এর অধীন। আমরা কেবল সেই সব হাদীসই গ্রহণ করব যেগুলি কুরআন করীমের অনুসারী হবে, অন্যথায় সেগুলি প্রত্যাখ্যান করব। অনুরূপভাবে যে সমস্ত হাদীস প্রকৃতির নিয়ম অনুসারে আছে সেগুলি গ্রহণযোগ্য হবে, কেননা আল্লাহ্ তা’লার বাণী ও তাঁর কর্ম পরস্পরের বিরোধী হতে পারে না।”

(হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে কারনামে, আনোয়ারুল উলুম, ১০ম খণ্ড, পৃ:১৫৯-১৬০)

বিলোপকারী ও বিলুপ্ত (আয়াতসমূহ)

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) বলেন:

‘দ্বিতীয় ধারণা মুষলমানদের মধ্যে তৈরী হয়েছিল যে কুরআন করীমে একটি অংশ বিলুপ্ত হয়ে গেছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে এর উত্তর দিয়েছেন। যে আয়াতগুলিকে লোকেরা বিলুপ্ত বলে আখ্যা দিত, তিনি সেগুলির এমন তত্ত্বজ্ঞান বর্ণনা করলেন, যা শুনে শত্রুরাও আশ্চর্য হল। তাঁর নির্দেশিত নীতি অনুসারে কুরআন করীমের একটি আয়াতও এমন নেই যার প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করা যায় না। যারা কুরআনের একাধিক আয়াতকে বিলুপ্ত বলে দাবি করত, সেই সব অ-আহমদীরাই এখন ইসলামের শত্রুদের সামনে সেই আয়াতগুলিকে উপস্থাপন করে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করছে।” (হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে কারনামে, আনোয়ারুল উলুম, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১৪৭)

তিনি আরও বলেন, ‘হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন, কুরআন করীমের একটি শব্দও বিলুপ্ত হয় নি। যে আয়াতগুলিকে বিলুপ্ত বলে দাবি করা হত, তিনি সেগুলির সূক্ষ্ম ও তাত্ত্বিক অর্থ বর্ণনা করেছেন।”

(হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে কারনামে, আনোয়ারুল উলুম, ১০ম খণ্ড, পৃ: ১৫৯)

বিলোপকারী ও বিলুপ্ত আয়াত প্রসঙ্গে হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

“ সত্য কথা এই যে, কুরআন করীমে প্রকৃত সংযোজন ও প্রকৃত বিয়োজন বৈধ নয়। কেননা এর ফলে এটির প্রত্যাখ্যান অনিবার্য হয়ে পড়ে। হানাফীদের ফিকাহ গ্রন্থ নুরুল আনোয়ারের ৯১ নং পৃষ্ঠায় লেখা আছে, কুরআন করীমে সকল ধর্মীয় বিষয় লিপিবদ্ধ আছে, কোন বিষয় এর বাইরে নেই। এর সহায়ক গ্রন্থ তফসীর সমূহের কথাগুলি যদি বর্ণনা করা হয়, তবে এর জন্য একটি অফিস দরকার হবে। কাজেই প্রকৃত বিষয় এই যে, যে বিষয় কুরআন করীমের বাইরে কিম্বা এর পরিপন্থী, তা প্রত্যাখ্যানযোগ্য আর সহীহ হাদীসগুলি কুরআন করীমের বাইরে নয়। কেননা ধারাবাহিক ওহীর মাধ্যমে সেগুলি প্রত্যাখ্যান ও গ্রহণ করার সময় কুরআনের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। তবে একথা সত্য যে, স্বয়ং রসূলুল্লাহ্ কিম্বা অন্য যে কেউ আংশিকরূপে সেই সব উৎকর্ষে পৌঁছেছে, সেগুলি বাতিল হিসেবে বের করে দেওয়া কিম্বা সঠিক প্রমাণ করা প্রত্যেকের কাজ নয়। আর এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, ঐশী নেয়ামত যাকে আংশিকরূপে সেই জ্ঞান দান করেছে, যা তার অনুসৃত রসূলকে দেওয়া হয়েছিল, তাকে কুরআন করীমের তত্ত্বজ্ঞান ও সূক্ষ্ম মারেফাত সম্পর্কে অবগত করা হয়।”

(আল হক লুধিয়ান, তফসীর মসীহ মওউদ , পৃ: ১৮৫-১৮৬)

আজ আমাদেরকে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর যুক্তি প্রমাণের আলোকে চেষ্টা করা উচিত যে আমরা যেন পৃথিবীকেবাসীকে সেই সব বিষয়ে অবগত করি। নচেত এগুলি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তারা ক্ষতির মুখেই পড়ছে। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মৌলিক বিশ্বাসের সিদ্ধান্ত জারি করেছেন। আর তাঁর পরে আহমদীয়া খিলাফতের মাধ্যমে ভবিষ্যতে কিয়ামত পর্যন্ত অন্যান্য আনুষঙ্গিক বিষয়ে হযরত আকদস (আ.)এর শিক্ষার অক্ষ বরাবরই আমরা পথপ্রদর্শন লাভ করতে থাকব। আর এভাবে এই সম্মানীয় জাতি জামাত আহমদীয়ার মাধ্যমে প্রকৃত উন্নতির রাজপথে পদবিক্ষেপ করতে থাকবে। আল্লাহই সহায়।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন:

ইহজগত দিনকয়েকের। কেউ জানে কে কতদিন জীবিত থাকবে। একদিন সকলেই মৃত্যু বরণ করবে আর আল্লাহ্ তা’লার সমীপে উপস্থিত হবে। সেই সময় কেবল সঠিক ধর্মবিশ্বাস এবং পুণ্যকর্ম ছাড়া আর কিছুই কাজে আসবে না। দরিদ্র ব্যক্তিও এই পৃথিবী থেকে শূন্য হাতে যায়। ধনী কিম্বা বাদশাহ, কেউই আজ পর্যন্ত এই পৃথিবী থেকে কিছু নিয়ে যায় নি। সঙ্গে যায় কেবল মানুষের ঈমান ও পুণ্যকর্ম। অতএব আল্লাহ্ তা’লার প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের উপর ঈমান আনুন, যাতে আল্লাহ্ তা’লার পক্ষ থেকে আপনাকে শান্তি দেওয়া হয় আর ইসলামের ডাকে সাড়া দিন, যাতে আপনি শান্তি থেকে অংশ পান।”

(আনোয়ারুল উলুম, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৫৯৫-৫৯৬)

মিনারাতুল মসীহর নির্মাণ, ইতিহাস এবং চাঁদাদাতাদের নামসমূহ

– মহম্মদ হামীদ কাওসার, নাযির দাওয়াতে ইলাল্লাহ, ইনচার্জ আহমদীয়াতের ইতিহাস বিভাগ,কাদিয়ান।

হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.) আগমণকারী প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, সেগুলিতে একথারও উল্লেখ ছিল যে,

”اِذْ بَعَثَ اللّٰهُ الْمَسِيْحَ ابْنَ مَرْيَمَ فَيَنْزِلُ
عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ“

অর্থাৎ যখন আল্লাহ্ তা’লা (রূপক) ঈসা ইবনে মরিয়মকে (অর্থাৎ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী) কে আবির্ভুত করবেন, তখন তিনি এক শুভ্র মিনারের নিকট অবতীর্ণ হবে, যা দামাস্কের পূর্বদিকে অবস্থিত হবে।

(সহী মুসলিম, কিতাবুল ফিতন)

ইতিহাস সাক্ষী আছে, আঁ হযরত (সা.) যখন এই ভবিষ্যদ্বাণী করছিলেন, তখন দামাস্কে কোন শুভ্র মিনার ছিল না। যতগুলি মিনার তৈরী হয়েছে, সেগুলি সবই পরে নির্মাণ করা হয়েছে।

মিনার’ শব্দটি ‘নুর’ শব্দ থেকে উদ্ভুত। ‘আল মিনারাতুল বায়যাহ’ এর (শুভ্র মিনার) এটিও একটি অর্থ যে, উম্মতে মুহাম্মাদীয়ায় আল্লাহ্ তা’লা যাকে রূপক ঈসা হিসেবে প্রেরণ করবেন, তাকে ইসলাম ধর্মের সত্যতা প্রকাশের জন্য আলোকময় ও উজ্জ্বল যুক্তিপ্রমাণ সহকারে পাঠাবেন। তাঁর আলোকিত যুক্তির সামনে মিথ্যা ধর্মের অন্ধ যুক্তিসমূহ বিলুপ্ত হয়ে যাবে। সৎপ্রকৃতির মানুষেরা সাক্ষী আছেন যে, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানীর আবির্ভাবের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা’লা আঁ হযরত (সা.)এর মুখ নিঃসৃত বাণীকে অক্ষরে অক্ষরে পূর্ণ করে দেখিয়েছেন। তাঁর পুস্তকাবলী, কথনী, লেখনী, পত্রাবলী, ইশতেহার ইত্যাদি রচনা এই সাক্ষ্য বহন করে যে, তিনি মিথ্যা ধর্মসমূহের অন্ধ যুক্তিকে জ্যোতির্ময় যুক্তিপ্রমাণ দ্বারা খণ্ডন করেছেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীকে আক্ষরিক বা বাহ্যিক অর্থে পূর্ণ করার জন্যও হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ‘মিনারাতুল মসীহ’ নির্মাণে উদ্যোগী হন।

আঁ হযরত (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণীকে পূর্ণ করতে মিনার নির্মাণের উদ্যোগ।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কাদিয়ানে মিনার নির্মাণের আহ্বান জানিয়ে লেখেন:

১)‘ইসলামে দুবার এই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ করার প্রচেষ্টা হয়েছে। প্রথম প্রচেষ্টা হয়েছে ৭৪১ হিজরীর পূর্বে, যখন দামাস্কের পূর্বে শ্বেত পাথরের একটি মিনার নির্মিত হয়, যা দামাস্কের পূর্ব প্রান্তে জামি উম্‌বীর একটি অংশ ছিল। কথিত আছে, কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয়ে এই মিনার নির্মিত হয়। নির্মাতাদের উদ্দেশ্য ছিল রসুলুল্লাহ (সা.)–এর ভবিষ্যদ্বাণী যাতে পূর্ণতা পায়। কিন্তু পরবর্তীতে আনসারীরা সেই মিনারাটি পুড়িয়ে দেয়। এই ঘটনার পর ৭৪১ হিজরীতে পুনরায় দামাস্কের পূর্বে মিনার তৈরীর চেষ্টা হয়। এই মিনারার জন্যও প্রায় এক লক্ষ টাকা একত্রিত করা হয়। কিন্তু বিধির বিধান পূর্ণ হল, জামি উমবীতে আগুন লেগে গেল আর সেই মিনারাও পুড়ে গেল। যাইহোক দুইবারই মুসলমানেরা এই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়।”

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১৫. ১লা জুলাই, ১৯০০)

২) এটি সেই ধরণের উদ্দেশ্য যেমনটি হযরত উমর (রা.) এক সাহাবীকে পারস্যের যুদ্ধ লব্ধ সম্পদ থেকে স্বর্ণ বালা পরিয়েছিলেন যাতে একটি ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হয়।

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১৬)

মিনার নির্মাণের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মিনার নির্মাণের তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য বর্ণনা করেছেন-

১) প্রথমত, মুয়াযযেন যেন এর উপরে উঠে পাঁচ ওয়াক্ত আযান দিতে পারে। এবং দিনরাতে পাঁচ বার উচ্চধ্বনিতে খোদা তা’লার পবিত্র নামের প্রচার হয়। এবং সংক্ষিপ্ত কথায় পাঁচ ওয়াক্ত আমাদের পক্ষ থেকে মানবতার উদ্দেশ্যে এই বাণী উচ্চারিত হয় যে, সেই আদি ও চিরন্তর খোদা, সমগ্র মানবজাতিকে যাঁর উপাসনা করা উচিত, তিনিই সেই খোদা যাঁর দিকে তাঁর সম্মানিত ও পবিত্র রসুল মহম্মদ মুস্তফা (সা.) পথপ্রদর্শন করেন। তিনি ছাড়া অন্য কোন খোদা নেই, না আকাশে, না পৃথিবীতে।”

(রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৬, পৃ: ১৬)

২) এই মিনারের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হবে, এর প্রাচীরের অনেক উঁচুতে একটি বড় লণ্ঠন লাগানো হবে, যার আনুমানিক মূল্য ১০০ টাকা বা এর কিছু অধিক হবে। এই আলো মানুষের চোখকে আলোকিত করতে দূর দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়বে। ”

(রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৬, পৃ: ১৬)

মিনার নির্মাণের জন্য খরচের জোগাড়

১৯০০ সালে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন মিনারাতুল মসীহ নির্মাণের পরিকল্পনা করলেন, তখন জামাতের সদস্যা সংখা বেশি ছিল না। আর তাদের আর্থিক অবস্থাও তেমন স্বচ্ছল ছিল না যে তারা মিনার নির্মাণের জন্য খুব বেশি চাঁদা দিতে পারতেন। হযরত সাহেবযাদা মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ (খলীফাতুল মসীহ সানী) বর্ণনা করেন যে, হযরত আকদস মসীহ মসজিদে মুবারকে উপবিষ্ট ছিলেন। মিনার নির্মাণের প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। মীর হিসামুদ্দীন সাহেব সিয়ালকোটী দশ হাজার টাকার বাজেট তৈরী করেন। কিন্তু সমস্যা গিয়ে দাঁড়াল এই যে দশ হাজার টাকা আসবে কোথা থেকে? কেননা সেই সময় জামাতের অবস্থা বেশি দুর্বল ছিল। এমতাবস্থায় মিনার নির্মাণ করা কঠিন কাজ ছিল। হুযুর (আ.) বার বার একথাই বলছিলেন, ‘এমন কোন প্রস্তাব দাও, যাতে এর থেকে কম টাকা খরচ হয়। ’ অবশেষে হুযুর হাজার টাকাকে এক এক শ’ টাকার ভাগে ভাগ করে দিলেন। ১৯০০ সালের ১লা জুলাইয়ের ইশতেহারে মিনারের খরচ সংগ্রহের জন্য হযরত আকদস তাঁর ১০১ জন সেবকের একটি তালিকা প্রকাশ করে কম করে একশ টাকা চাঁদা দেওয়ার আহ্বান জানালেন। এবং এই আহ্বানে সাড়াদানকারীদের নাম মিনারের গায়ে স্মারক হিসেবে খোদাই করে লেখার সিদ্ধান্ত নেন। এই আহ্বান জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই মুনশী আব্দুল আযীয সাহেব উজালবী, সিয়ালকোটের কাঠের ব্যবসায়ী মিঞা শাদি খান সাহেব, মৌলবী মহম্মদ আলি সাহেব এম. এ এবং শেখ নিয়াজ আহমদ সাহেব (ব্যবসায়ী)- তাঁর এই চারজন নিষ্ঠাবান সেবক হুযুরের শর্ত অনুসারে চাঁদা উপস্থাপন করেন। যাঁদের মধ্যে হুযুর (আ.) প্রথমোক্ত দুই

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে এবং তা হৃদয়াঙ্গম করে সে ধনী, তার কোনও প্রকার দারিদ্রের আশঙ্কা নেই।

(সুনান সঈদ বিন মনসুর)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Dist-Murshidabad

যুগ খলীফার বাণী

জামাতের সদস্যদের উচিত তাকওয়া এবং আধ্যাত্মিকতায় উন্নতি সাধন করা, এটিই জামাত প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য।

(স্ক্যান্ডেনেভিয়ান জলসায় হুযুর আনোয়ার-এর বিশেষ বার্তা, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata

সাহাবার নাম অত্যন্ত প্রশংসাসহকারে ইশতেহারের সূচনাতেই উল্লেখ করেন এবং তাঁদের ত্যাগস্বীকারকে জামাতের জন্য ঈর্ষণীয় আখ্যা দেন। হযরত উম্মুল মোমেনীন (রা.) মিনারের জন্য এক হাজার টাকা চাঁদা প্রতিশ্রুতি দেন, যা তিনি দিল্লীর একটি বাড়ি বিক্রী করে দান করেন। ১৯০৩ সালের ১৩ই মার্চ, মোতাবেক হিজরী ১৩২০, ১৩ জুল হজ্জ, শুক্রবার মিনারাতুল মসীহ্র ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। সে দিন জুমআর নামাযের পর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সমীপে হাকীম ফযলে ইলাহি সাহেব লাহোরী, মির্যা খোদা বখশ সাহেব, শেখ মৌলানা বখশ সাহেব, কাযি যিয়াউদ্দীন সাহেব ও প্রমূখ নিবেদন করেন যে, হুযুরের হাতে মিনারার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা যথাপোযুক্ত হবে। হুযুর (আ.) বললেন, আমি তো এখনও জানি না যে আজ মিনারাতুল মসীহর গোড়াপত্তন হবে। একটি ইট নিয়ে আসুন, সেটিতে দোয়া করব, এরপর আমি যেখানে বলব, রেখে দিবেন। হাকীম ফযলে ইলাহী সাহেব ইট নিয়ে আসেন। হুযুর (আ.) সেটি ঊরুর উপর রেখে দীর্ঘ দোয়া করেন। দোয়ার পর তিনি ইটটিকে দম করেন এবং হাকীম ফযলে ইলাহি সাহেবকে নির্দেশ দিলেন, ‘এই ইটটিকে আপনি (প্রস্তাবিত) মিনারাতুল মসীহর পশ্চিম অংশে রেখে দিবেন। হাকীম সাহেব এবং অন্যান্য সাহাবাগণ এই বরকতময় ইটটি নিয়ে যখন মসজিদে আকসা পৌঁছলেন, তখন মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব (রা.) নামায পড়িয়ে ফিরে আসছিলেন। মৌলবী সাহেবের রীতি ছিল, তিনি জুমআর নামাযের পর দীর্ঘক্ষণ মসজিদে বসে থাকতেন। জ্ঞান ও প্রজ্ঞার এক মোহময় বৈঠক চলত, যেখানে বহিরাগত সদস্যরা তাঁর চারপাশে একত্রিত হত এবং তাঁর জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে উপকৃত হত। সেদিনও তিনি রীতিমত দেরী করে ফিরছিলেন। পথিমধ্যে সকল বৃত্তান্ত জ্ঞাত হয়ে তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন এবং সেই ইটটি বুক জড়িয়ে ধরে দীর্ঘক্ষণ দোয়া করতে থাকেন এবং বলেন, ‘এই কাজ ফিরিশতাদের মাঝে সাক্ষ্য হিসেবে সম্পন্ন হোক, এটিই আমার বাসনা। শেষে ইটটি ফযলুদ্দীন সাহেব আহমদী মিস্ত্রী ভিতের পশ্চিম অংশে বসিয়ে দেন আর হযরত মীর নাসের নওয়াব সাহেব (রা.) এর তত্বাবধায়ক হিসেবে নিযুক্ত হন।

মিনারের ভিত অত্যন্ত গভীর ও প্রশস্ত কংক্রীটের মাধ্যমে মজবুত করে তোলা হয়েছে।

মিনার নির্মাণ বন্ধ করতে আহমদীয়াতের শত্রুরা সরকারী অফিসারের দ্বারস্থ হল।

শুরু থেকেই কাদিয়ানে আর্যসমাজীদের মধ্য থেকে এক শ্রেণীর মানুষ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর ইসলাম সেবার বিরোধীতা করে এসেছে। কখনও অমৃতসর থেকে পণ্ডিত খড়ক সিংহকে কাদিয়ান ডেকে এনে হযরত মসীহ মওউদ(আ.)-এর সঙ্গে মোনাযারার আমন্ত্রণ দিয়েছে। কখনও ইসলাম এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে মিথ্যাবাদী হিসেবে প্রতিপন্ন করার জন্য ‘শুভ চিন্তক’ পত্রিকার প্রবর্তন করেছে।

যখন মিনারাতুল মসীহর ভিত রাখা হল, তখনও এরাই প্রবল বিরোধীতা আরম্ভ করে দিল। মিনার নির্মাণের কাজ বন্ধ করে দেওয়ার জন্য কাজ বন্ধের নির্দেশ জারি করানোর জন্য তারা সরকারী অফিসারের দ্বারস্থ হল। জেলা আধিকারীরাও এ বিষয়ের তদন্তের জন্য ১৯০৩ সালের ৮ই মে বাটালার তেহসীলদারকে কাদিয়ান যাওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি যখন কাদিয়ান পৌঁছলেন , তখন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.), সান্ধ্য ভ্রমণের বের হয়ে পড়েছিলেন। প্রায় আধ ঘন্টা পর হুযুর ফিরে এলে নিম্নোক্ত প্রশ্নোত্তর পর্ব সম্পন্ন হয়।

তেহসীলদার: মিনারা কেন নির্মাণ করা হচ্ছে?

হুযুর (আ.) ১) মিনার নির্মাণের এটিও একটি বরকত রয়েছে, এতে চড়ে খোদার নাম উচ্চারণ করা হবে আর যেখানে খোদার নাম উচ্চারিত হয়, সেখানে বরকত হয়।

২) এর উপর একটি লণ্ঠন লাগানো হবে, যার আলোতে দূর দূরান্ত পর্যন্ত দেখা যাবে।

৩) একটি বিশালাকার ঘড়ি লাগানো হবে।

৪) এর ফলে পর্দাহীনতা হবে, এমন ধারণা অলীক। এখন আমার সামনে ডেপুটি শঙ্কর দাস সাহেবের বাড়ি আছে আর তা এত উঁচু যে এর উপর চড়লে ঠিক আমার বাড়ির উপর দৃষ্টি পড়ে। তাই আমি কি বলব সেটি ভেঙ্গে ফেলা হোক? আমাকে নিজের পর্দা নিজেই করতে হবে।’

হযরত হাফিয রওশন আলি সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, যখন মিনারাতুল মসীহ নির্মাণের তোড়জোড় শুরু হয়, তখন কাদিয়ানের মানুষ অফিসারের কাছে অভিযোগ করেন যে, মিনারা তৈরী হলে তাদের বাড়ির পর্দাহীনতা হবে। তাই সরকারের পক্ষ থেকে একজন ডেপুটি অফিসার কাদিয়ান আসেন, যিনি হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে মসজিদ মুবারক সংলগ্ন বায়তুল ফিকর কামরায় সাক্ষাত করেন। সেই সময় কাদিয়ানের কিছু মানুষ যারা অভিযোগ করতে চাইছিলেন, তারা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। হযরত সাহেবের সঙ্গে ডেপুটির কথাবার্তা হতে থাকল। কথাবার্তার সময় হযরত সাহেব ডেপুটি সাহেবকে সম্বোধন করে বলেন, এই যে বুঢঢামল বসে আছেন, আপনি এঁকেই জিজ্ঞাসা করুন, বাল্যকাল থেকে আজ পর্যন্ত কখনও কি এমনটি হয়েছে যে, উপকারের কোনও সুযোগ এসেছে আর তার উপকারে আমি কোনও ত্রুটি রেখেছি? তাকেই জিজ্ঞাসা করুন, কখনও কি এমন হয়েছে যে আমাকে কষ্ট দেওয়ার সে সুযোগ পেয়ে আমাকে কষ্ট দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি রেখেছে। হাফিয সাহেব বর্ণনা করেন, আমি সেই সময় বুঢঢামলের দিকে তাকিয়ে ছিলাম, সে লজ্জায় মাথা হেট করে বসে ছিল। তার চেহারা পাংশুবর্ণ ধারণ করে উঠেছিল। একটি কথাও তার মুখ দিয়ে বের হয় নি।’

(সীরাতুল মাহদী, ১ম ভাগ, পৃ: ১৩৮, রেওয়ায়েত নম্বর-১৪৮)

অবশেষে এই বিবাদ গুরুদাসপুরের ডেপুটি কমিশনার বাহাদুরের আদালতে গিয়ে পৌঁছল। সেখানে যে মীমাংসা ঘোষিত হল তা নিম্নরূপ।

‘নকল-প্রতি সভার বিচারক: সি.এ.ডালিস সাহেব বাহাদুর ডেপুটি কমিশনর, বাহাদুর জেলা, গুরুদাসপুর।

মীমাংসা: ১৩ই মে, ১৯০৩,মুকদ্দমা নম্বর-৪-১৭ মিনারাতুল মসীহর নির্মাণ বিষয়ক কাগজপত্র

বাদি: কাদিয়ানের ওজরদার

বিবাদী: কয়েকজন কাদিয়ান নিবাসী।

আপাতত এমন কোন বিষয় নেই যার দ্বারা শান্তি বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা হতে পারে। কাগজপত্র অফিসে জমা দেওয়া হোক।

(আল হাকাম, ১০ই জুন, ১৯০৩, পৃ: ৪-১০)

এই সিদ্ধান্ত ঘোষণার পরই আহমদীয়াতে শত্রুদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ হয়ে যায়। আলহামদোলিল্লাহ আলা

যুগ ইমামের বাণী

“যতক্ষণ পর্যন্ত না নিজের প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুগুলিকে ব্যয় করবে, ততক্ষণ প্রিয়ভাজন হওয়ার সম্মান লাভ হতে পারে না।”

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৬৪)

দোয়াপ্রার্থী: Ayesha Begum, Harhari, Murshidabad

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: তোমাদের নিকট যখন কোন জাতির সম্মানীয় কোন ব্যক্তি আসে তখন তাকে যথাযোগ্য সম্মান দাও।

(সুনান ইবনে মাজা)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

যালিক।

আর্থিক সমস্যার কারণে মিনার নির্মাণে বিলম্ব

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ঐশী ইঙ্গিত অনুসারে মিনারাতুল মসীহ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু কিছু সমস্যার কারণে নির্মাণ কার্য বন্ধ করতে বাধ্য হতে হয়।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) বর্ণনা করেন, যখন মিনারার কাজ (অর্থাভাবে) বন্ধ হয়ে থাকল, তখন একদিন জনৈক ব্যক্তি প্রশ্ন করল যে, হুযুর! এই মিনার কবে তৈরী হবে? হুযুর বলেন, সমস্ত কাজ যদি আমিই শেষ করে যায়, তবে পরে আসা ব্যক্তিদের জন্য পুণ্য কোথা থেকে আসবে। কাজেই এতটুকু সম্ভব হয়। হুযুর (আ.)-এর জীবনে মিনারার কাঠামো মসজিদের আঙিনার মেঝে থেকে ছয় ফুটের বেশি উঁচু হতে পারে নি।

মিনারাতুল মসীহর নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ হওয়া

আল্লাহ্ তা'লা হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) কে ১৪ই মার্চ, ১৯১৪ সালে খিলাফতের আসনে অধিষ্ঠিত করেন। এই পদের দায়িত্ব গ্রহণের কয়েক মাস পরেই অর্থাৎ ১৯১৪ সালের ২৭ শে নভেম্বর মিনারের অসম্পূর্ণ কাঠামোর উপর নিজের হাতে ইট রেখে এর নির্মাণ কাজ পুনরায় শুরু করান। এবার নির্মাণকার্যের তত্ত্বধায়ক ছিলেন কাযি আব্দুর রহীম ভট্টী সাহেব। এর জন্য আজমের থেকে উৎকৃষ্ট মানের শ্বেত পাথর আনা হয় এবং অবশেষে খোদার রসূলের নবুয়তের এই শক্তিশালী নিদর্শন ১৯১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে পূর্ণতা লাভ করল। এই দৃষ্টিনন্দন মিনারটি (যা স্থাপত্য শৈলীর এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন) একশ পাঁচ ফুট উঁচু। তিন তল বিশিষ্ট এই মিনারে একটি গম্বুজ ও বিরানব্বইটি সিড়ি আছে।

আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে মিনরাতুল মসীহ্র সুরক্ষা ও রক্ষণাবেক্ষন

বিগত একশ বছরের বহু ভূমিকম্প এবং ঝড় তুফান এসেছে। এই সব প্রাকৃতিক দুর্যোগেও আল্লাহ্ তা'লা মিনারাতুল মসীহকে রক্ষা করেছেন। ২০০৫ সালের ৮ই অক্টোবর সকালে প্রায় ৯: ২৫ টায় ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়। এই অধম সেদিন মসজিদ আকসার পূর্বে অবস্থিত সদর আঞ্জুমানের পুরোনো অফিস ইমারতের দক্ষিণ প্রান্তে আঙিনায় মিনারার ঠিক নীচেই দাঁড়িয়ে ছিল। মিনরাতুল মসীহ্র আশপাশের সমস্ত ঘরবাড়ি দোদুল্যমান ছিল, কিন্তু মিনারাতুল মসীহ্কে বিন্দুমাত্র দুলতে দেখা যায় নি। মনে হচ্ছিল যেন, খোদার হাত এটিকে ধরে রেখেছে। ভূমিকম্পে এই ঐশী নিদর্শনের কোন ক্ষতি হয় নি।

কাদিয়ানের বাসিন্দা সৎ প্রকৃতির হিন্দু শিখ বন্ধুরা এই সত্যকে অকপটে স্বীকার করতেন যে, মিনারার বরকতে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে দুর্যোগ থেকে বিপদমুক্ত রাখেন। একথা স্বীকারকারীদের মধ্যে হাকীম সোরান সিং, জ্ঞানী লাভ সিং এখানকার পরিচিত মুখ, যাঁরা এখন পরলোক গমন করেছেন।

কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লেখেন, 'সেই সব বন্ধুদের নাম লেখা হবে, যারা কম করে একশ টাকা মিনারের জন্য চাঁদা দিয়েছেন। আর এই নামগুলি সুদীর্ঘকাল ধরে মিনারের দেওয়ালে খোদিত থাকবে। যা আগামী প্রজন্মকে দোয়ার সুযোগ দিতে থাকবে।"

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ৩১৯)

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর উক্ত ঘোষণা অনুসারে ৩০৬ জন চাঁদাদাতার নাম মিনারায় খোদাই করা আছে। কালের প্রবাহে খোদাই করা নামগুলির কালি অস্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) এর সমীপে একথা জানানো হলে তিনি খোদাই করা নামগুলিকে উজ্জ্বল কালি দিয়ে পূর্ণ করার নির্দেশ দেন। হুযুর আনোয়ার এর নির্দেশ ও দিক-নির্দেশনা অনুসারে ওয়াকীল তামিল ও তানফীয (ভারত, নেপাল, ভুটান) মাননীয় ফাতেহ আহমদ খান সাহেব ডাহরী, ২০২০ সালের জানুয়ারী মাসে লেখাগুলি রঙ করার কাজ নিজ তত্বাবধানে নাযামত তামিরাত কাদিয়ানের মাধ্যমে সম্পূর্ণ করেন। জাযাকুমুল্লাহু আহসানুল জাযা।

এই নামগুলি এখন দূর থেকে পড়া যায় আর পাঠকরা চাঁদাদাতাদের জন্য দোয়াও করেন। আলহামদোলিল্লাহি আলা যালিক।

বর্তমানে যে ৩০৬জন সৌভাগ্যবান চাঁদাদাতাদের নাম মিনারাতুল মসীহর উপর খোদাই করা আছে, সেগুলি নীচে দেওয়া হল।

১) হযরত মির্যা গোলাম আহমদ, মসীহ ও মাহদী (আ.)।

২) হযরত মৌলবী নুরুদ্দীন, খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.)

৩) হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.)

৪) হযরত নুসরাত জাহাঁ বেগম উম্মুল মোমেনীন।

৫) হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ।

৬) হযরত নওয়াব মহম্মদ আলি খানি, মালের কোটলা রঈস।

৭) ডক্টর মীর মহম্মদ ইসমাঈল সিভিল সার্জেন,কাদিয়ান।

৮) হাফিয রওশন আলি (রা.) কাদিয়ান।

৯) মৌলবী যুলফিকার আলি খান গোহর, রামপুরী, মুহাজির কাদিয়ান।

১০) মহম্মদ হায়াত খান পেনশনর হাফিযাবাদী।

১১) মৌলবী গোলাম আকবর খান নওয়াব আকবার ইয়ারে জঙ্গ, হায়দ্রবাদা দক্ষিণ।

১২) বাবু মহম্মদ আফযল, সুপাইনটেনডেন্ট, দফতর রেসিডেন্ট উজিরিস্তান।

১৩) খান বাহাদুর মহম্মদ আলি খান, নেগলস পলিটিক্যাল অফিসার, কোটহাট।

১৪) খান সাহেব চৌধুরী নেয়ামোতুল্লাহ খান,সাব জাব বেগম পুর।

১৫) রশীদা বেগম, সহধর্মিণী চৌধুরী যাফরুল্লাহ্ খান সাহেব ব্যারিস্টারেট, লাহোর।

১৬) মহম্মদ আফযাল খান, আফগান গিলযি, ডেরা গাযি খান।

১৭) দৌলত খাতুন।

১৮) আলতাফ মহম্মদ খান, ডেরা গাযি খান।

১৯) কুরায়েশী মুখতার আহমদ।

২০) মরিয়ম সিদ্দিকা, সহধর্মীণি বাবু মহম্মদ শফী নও শহরা জেলা সিয়ালকোট।

২১) কাযি সৈয়্যদ আমীর হোসেন কাদিয়ান।

২২) মৌলবী মহম্মদ সাঈদ হায়দ্রাবাদী দক্ষিণ।

২৩) মুনশী শাদি খান, কাদিয়ান।

২৪) মৌলবী মহম্মদ আলি এম.এ এল এল বি।

২৫) শেখ নিয়া আহমদ তাজির, উজিরাবাদ।

২৬) মুনশী আব্দুল আযীয পটওয়ারী, কাদিয়ান।

২৭) হাজি শেঠ আব্দুর রহমান সওদাগর, মাদ্রাস।

২৮) শেঠ আলি মহম্মদ সওদাগর, ব্যাঙ্গলোর।

২৯) হাজি শেঠ সালেহ মহম্মদ সওদাগর।

৩০) শেঠ আহমদ সওদাগর, মদ্রাস।

৩১) শেঠ ওয়ালজি লালজি সওদাগর মাদ্রাস।

৩২) মৌলবী যাহুর আলি উকিল হায়দ্রাবাদ দক্ষিন।

৩৩) মীর হামিদ শাহ সিয়ালকোট।

৩৪) নওয়াব সৈয়্যধ মহম্মদ রিজবী, বোম্বাই।

৩৫) মুফতি মহম্মদ সাদিক,কাদিয়ান।

৩৬) মিস্ত্রি আহমদ দ্বীন, ভেরাহ।

৩৭) ডক্টর খলীফা রশীদুদ্দীন, কাদিয়ান।

৩৮) খলীফা নুরুদ্দীন, জম্মু।

৩৯) হাফিয মহম্মদ ইসহাক, হায়দ্রাবাদ।

৪০) সৈয়্যদ নাসির শাহ, কদিয়ান।

৪১) সৈয়্যদ গোলাম গউস,কাদিয়ান।

৪২) সৈয়্যদ ফযল শাহ, কাদিয়ান।

৪৩) ডক্টর রহমত আলি, আফ্রিকা।

যুগ খলীফার বাণী

"আপনাদের যাবতীয় চিন্তা জাগতিকতাকে ঘিরে যেন না হয়, বরং ধর্মের ক্ষেত্রে উন্নতিই যেন প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়। এর ফলে জাগতিকতা ও ধর্ম, উভয় দিকই লাভবান হবে।"

(স্ক্যান্ডেনেভিয়ান জলসায় হুযুর আনোয়ার-এর বিশেষ বার্তা, ২০১৮)

দোয়াপ্রার্থী: **Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)**

৪৪) বাবু মহম্মদ আফযাল, এডিটর আখবার বদর।

৪৫) ডক্টর মহম্মদ ইসমাঈল খান, গাড়াইয়ানী।

৪৬) পীর বরকাত আলি রানমাল।

৪৭) শেখ গোলাম নবী শেঠী, কাদিয়ান।

৪৮) মৌলবী শের আলি, বি.এ কাদিয়ান।

৪৯) মৌলবী আব্দুল্লাহ্ সানোরী।

৫০) মিঞা রহমতুল্লাহ সানোরী।

৫১) মিঞা আব্দুর রহীম সনোরী।

৫২) মিঞা হাবীবুল্লাহ্ সানোরী।

৫৩) সুফি আব্দুল কাদীর বি,এ সানোরী।

৫৪) মাস্টার কাদির বখশ, লুধিয়ানা।

৫৫) মৌলবী আব্দুল রহীম দরদ এম.এ কাদিয়ান।

৫৬) বাবু গুলাব খান, সিয়ালকোট।

৫৭) মিঞা মহম্মদীন জিলদ সায, সিয়ালকোট।

৫৮) মাস্টার কমরুদ্দীন, লুধিয়ানা

৫৯) মৌলবী আব্দুল খাদির মানসুরাঁ, লুধিয়ানা।

৬০) মুনশী মহম্মদ আকবার ঠেকেদার, বাটালা।

৬১) হাকীম মহম্মদ হোসেন কুরায়েশী, লাহোর।

৬২) মুনশী মহম্মদ জান উজলা।

৬৩) চৌধূরী হাকিম আলী খান, কাদিয়ান।

৬৪) মিঞা মহম্মদ সিদ্দিক সেখওয়াঁ।

৬৫) মিঞা ইমামুদ্দীন সেওয়াঁ।

৬৬) মিঞা জামালুদ্দীন সেখওয়াঁ

৬৭)মৌলবী গোলাম ইমাম শাহজাহানপুরী।

৬৮) মিঞা খাইরুদ্দীন সেখওয়াঁ।

৬৯) সুফী নবী বখশ মুম্বাসা।

৭০) শেখ আব্দুর রহমান মাম্বাসা।

৭১) শেখ মহম্মদ কারাম ইলাহী, পাটিয়ালা।

৭২) বাবু রওশন দ্বীন সিয়ালকোট।

৭৩) বাবু শাহ দ্বীন ডোমিলি।

৭৪) হাজী মোল্লা ইমাম বখশ।

৭৫) শেঠ মূসা ইবনে উসমান জামনগর।

৭৬)ডক্টর রামানন্দ, গাড়ওয়াল।

৭৭) শেখ ইয়াকুব আলি, এডিটর আল হাকাম,কাদিয়ান।

৭৮) সহধর্মিণী শেখ ইয়াকুব আলি।

৭৯) মাহমুদা, শেখ ইয়াকুব আলি সাহেবের ভগিনী।

৮০) শেখ গোলাম গউস, ব্রাদার শেখ ইয়াকুব আলি।

৮১) হাজি গোলামআহমদ ক্রিয়াম।

৮২) মুনশী হাবীবুর রহমান হাজিপুর।

৮৩) কাযি মীর হাসান আলীপুর, মুলতান।

৮৪) মৌলবী উমরুদ্দীন সারিহ।

৮৫) মৌলবী উমরুদ্দীন সাহেবের সহধর্মিণী।

৮৬) বাবু জামালুদ্দীন গুজরাঁওয়ালা।

৮৭) মৌলবী আহমদ শের খান, হায়দ্রাবাদ।

৮৮) শেঠ শেখ হাসান ইয়াদগীর।

৮৯) মুনশী নাদির খান ঝিলম।

৯০) নাদির খান, ঝিলম।

৯১) মির্যা মহম্মদ সাদিক, লাহোর।

৯২) হাকীম ফযলে দ্বীন ভেরবী কাদিয়ান।

৯৩) মুনশী রুস্তম আলি।

৯৪) মিঞা নবী বখশ সোওদাগর, অমৃতসর।

৯৫) মিঞা চিরাগ দ্বীন, লাহোর।

৯৬) মৌলবী গোলাম হোসেন, পেশাওয়ার।

৯৭) শেখ রহমতুল্লাহ লাহোর।

৯৮) শেখ আব্দুর রহমান, লাহোর।

৯৯) মাস্টার গোলাম মহম্মদ বিএ সিয়ালকোট।

১০০) শেখ ফযলে হক, বাটালা।

১০১) শেখ মৌলা বখশ সিয়ালকোট।

১০২) মুনশী আল্লাহ্ দিত্তা, সিয়ালকোট।

১০৩) শেখ গোলাম হায়দার, সিয়ালকোট।

১০৪) মৌলবী আযীয বখশ বি.এ।

১০৫) মাস্টার ইসমাঈল, সিয়ালকোট।

১০৬) শেখ মহম্মদ জান সওদাগর, উজিরাবাদ।

১০৭) হাকীম মির্যা খোদা বখশ, লাহোর।

১০৮) মুনশীল মেহের দ্বীন।

১০৯) মুনশী মহম্মদককিম মুসা।

১১০) হাজি মুফতী গুলযার মহম্মদ বাটালা।

১১১) মির্যা হোসেন বেগ, গুজরাত।

১১২) সুফি মহম্মদ ইয়াকুব আফগানাঁ।

১১৩) বাবু ফখরুদ্দীন, ক্লার্ক সাপ্লাই ডিপো।

১১৪) ডক্টর আতাউল্লাহ্ খান ধর্মকোট বাঘা।

১১৫) বাব নিযামুদ্দীন মাইলপুর।

১১৬) মাস্টার আব্দুল আযীয, সিয়ালকোট।

১১৭) বাবু মহম্মদ ওযীর খান, কাদিয়ান।

১১৮) মৌলবী কুদরতুল্লাহ সানোরী।

১১৯) মিঞা আল্লাহ দ্বীন , রাওয়ালপিন্ডি।

১২০) রাজা আলি মহম্মদ এই, ঝিলম।

১২১) খান বাহাদুর শেখ মহম্মদ হোসেন, আলিগড়।

১২২) ডক্টর সৈয়্যধ বিলায়েত শাহ আফ্রিকা, কাদিয়ান।

১২৩) মুনশী গোহর আলি কোটলা আফগানাঁ।

১২৪) শেখ মুশতাক হোসেন গুজরাঁওয়ালাঁ।

১২৫) খান সাহেব মুনশী ফারযান্দ আলি, কাদিয়ান।

১২৬) খাদিজা বেগম, কাদিয়ান।

১২৭) আমাতুল্লাহ্ বেগম, সহধর্মিণী মুনশী ফারযান্দ আলি, কাদিয়ান।

১২৮) ডক্টর সৈয়্যদ আব্দুসসাত্তার শাহ, কাদিয়ান।

১২৯) সৈয়্যদাহ সাঈদাতুননিসা, সহধর্মিনী আব্দুস সাত্তার কাদিয়ান।

১৩০) ডক্টর হাশমোতুল্লাহ কাদিয়ান।

১৩১) খান সাহেব মুনশী বরকত আলি শিমলা।

১৩২) মৌলবী আব্দুর রহীম নাইয়ার,কাদিয়ান।

১৩৩) জামাত আহমদীয়া লাগোস, কাদিয়ান।

১৩৪) মৌলবী আলামগীর খান, সিন্ধ।

১৩৫) মিস্ত্রী আলি বখশ ফরীদকোট।

১৩৬) সহধর্মিনী মিস্ত্রী আলি বখশ, ফরীদকোট।

১৩৭) ডক্টর, জামাদার আব্দর রহীম, গুজরাঁওয়ালাহ।

১৩৮) শেখ আলি যাফর।

১৩৯) মুনশী মহম্মদ দ্বীন খাঁরিয়া

১৪০) মিঞা গোলাম নবী মাহিলপুর।

১৪১) শেখ ফজল আহমদ বাটালা।

১৪২) সহধর্মিণী শেখ ফযল আহমদ বাটালা।

১৪৩) ডক্টর সৈয়্যদ মহম্মদ হোসেন শাহ, ধর্মকোট রান্ধওয়াঁ।

১৪৪) ডক্টর সৈয়্যদ মহম্মদ হোসেন শাহ।

১৪৫) ডক্টর ফযলে দ্বীন, কাদিয়ান।

১৪৬) সহধর্মিনী ডক্টর ফযলে দ্বীন,কাদিয়ান।

১৪৭) ডাক্তার ফযলৈ দ্বীন সাহেবের পরিবার, কাদিয়ান।

১৪৮) শেখ আহমদুল্লাহ্ নওশহরাঁ ছাবনী।

১৪৯) কাযি আব্দুল্লাহ্ বি.এ কাদিয়ান।

১৫০) সুফি মহম্মদ আলি জানজুয়া, জালালপুর।

১৫১) বাবু মহম্মদ আব্দুল্লাহ্, ফিরোযপুর।

১৫২) ডক্টর ফযলে করীম,কাদিয়ান।

১৫৩)শেঠ আব্দুল্লাহ্ ভাই সেকেন্দ্রবাদ।

১৫৪) শেঠ আব্দুল্লাহ্ ভাই সেকেন্দ্রবাদ এর স্ত্রী।

১৫৫) শেঠ ইলাহী দ্বীন সেকেন্দ্রাবাদ।

১৫৬) বাবু মহম্মদ শফী, কাদিয়ান।

১৫৭) মাস্টার মহম্মদ দ্বীন বি এ কাদিয়ান।

১৫৮) মাস্টার মহম্মদ দ্বীন-এর সন্তানগণ, কাদিয়ান।

১৫৯) হাফিয সৈয়্যদ আব্দুল ওয়াহীদ মানসুরী।

১৬০) হাফিয সৈয়্যদ আব্দুল মাজীদ মনসুরী।

১৬১) বাবু এজায হোসেন দিল্লী।

১৬২) শেখ আব্দুর রহমান কাদিয়ানী।

১৬৩) সুবেদার গোলাম হোসেন, পাক পটন।

১৬৪) মাস্টার মহম্মদ তুফায়েল, কাদিয়ান।

১৬৫) ডক্টর শাহ নওয়ায সিয়ালকোট।

১৬৬) পীর মঞ্জুর মহম্মদ কাদিয়ান।

১৬৭) মুনশী গুল মহম্মদ কেম্বলপুর।

১৬৮) শেখ নিয়ায মহম্মদ গুজরাঁওয়ালাহ।

১৬৯) শেখ গোলাম হোসেন লুধিয়ানবী।

১৭০) শেঠ আলি মহম্মদ এম.এ সেকেন্দ্রাবাদ।

১৭১) ফাতিমা বেগম, সেকেন্দ্রাবাদ।

১৭২) বাবু ফযল দ্বীন মার্দান।

১৭৩) শেঠ ইসমাইল আদম, বম্বই।

১৭৪) ডক্টর গোলাম মুস্তাফা খারিয়াঁ।

১৭৫) সৈয়্যদ গোলাম হোসেন, ভেটরনারী ডিপার্টমেন্ট।

১৭৬) সৈয়্যদাহ জামীলা খাতুন, বিনতে সৈয়্যদ আহমদ হাসান মুযাফফর নগর।

১৭৭) মাস্টার মহম্মদ ইব্রাহিম, নানকানা সাহেব।

১৭৮) মিঞা মহম্মদ শরীফ লাহোর।

১৭৯) আমাতুর রহমান, ভেরাহ।

১৮০) খান বাহাদুর চৌধুরী মহম্মদ দ্বীন , ডেপুটি কমিশনর।

১৮১) মালিক মৌলা বখশ অমৃতসর।

১৮২) বাবু সিরাজুদ্দীন স্টেশন মাস্টার।

১৮৩) কুরায়েশী মহম্মদ উসমান কারনাল।

১৮৪) মির্যা বরকাত আলি আবাদান।

১৮৫) আমাতুর রহীম, পত্নী মির্যা বরকাত আলি ।

১৮৬) ইব্রাহিম ইউসুফ বারদোলী।

১৮৭) বাবু আব্দুর রহমান , আম্বালা।

১৮৮) হাজি শেখ মিরাঁ বখশ আম্বালা।

১৮৯) মিঞা খোদা বখশ হান্ডো।

১৯০) চৌধরী সাদিক আলি, গুজরাত।

১৯১) হাকীম ফযলুর রহমান,মুবাল্লিগ আফ্রিকা।

১৯২) ডক্টর মালিক মহম্মদ রমযান, শ্রী গোবিন্দপুর।

১৯৩) চৌধরী মহম্মদ ইসমাইল, সিয়ালকোট।

১৯৪) ই মালিক মুযাফফরপুর।

১৯৫) বাবু আলি হাসান সানোরী

১৯৬) ফাহমদীদা বেগম, বিনতে মদদ আলী শাহজাহানপুর।

১৯৭) পত্নী চৌধরী মুবারক আহমদ কোহাট।

১৯৮) চৌধুরী ফাতাহ মহম্মদ কাদিয়ান।

১৯৯) ডক্টর বদরুদ্দীন আহমদ আফ্রিকা।

২০০) মৌলবী আব্দুল গফুর কাদিয়ান।

২০১) ফাতিমাতুয যোহরা, পত্নী মৌলবী আব্দুল গফুর।

২০২) সর্দার মহম্মদ আলি।

২০৩) প্রফেসর মৌলবী আব্দুল লতিফ চিটাগঞ্জ।

২০৪) সৈয়্যদ মহম্মদ লতিফ চুক কযিয়াঁ, গুরদাসপুর।

২০৫) রসূল বিবি তালুন্ডি মূসা।

২০৬) সৈয়্যদ আব্দুল হালমী কটকী।

২০৭) বাবু উযীর মহম্মদ লাহোর।

২০৮) মৌলবী ফযলুদ্দীন, কাদিয়ান।

২০৯) চৌধরী নূর আহমদ খান, কাদিয়ান।

২১০) শেখ আব্দুল হামীদ শিমলা।

২১১) যয়নব বিবি, পত্নী ভাই মাহমুদ আহমদ কাদিয়ান।

২১২) মৌলবী আব্দুল মুগনী খান, কাদিয়ান।

২১৩) গোলাম মহম্মদ,পিতা মুরাদ বখশ, শেখুপুরা।

২১৪) সুবেদার মহম্মদ আব্দুল্লাহ ইন্ডিয়ান আর্মি, কাদিয়ান।

২১৫) সৈয়্যধ যয়নুল আবেদীন ওলীউল্লাহ্ শাহ।

২১৬) মিঞা মহম্মদ ইসমাইল, শেখুপুরা।

২১৭) চৌধরী সুলতান আলি গুজরাত।

২১৮) মৌলবী আব্দুল করীম গুজরাত।

২১৯) হাফিয সৈয়্যদ আব্দুল হামীদ মনসুরী।

২২০) মহম্মদ মদদ আলি, বাহাওয়ালপুর।

২২১) মৌলবী মহম্মদ আলি, কাদিয়ান।

২২২) চৌধরী আব্দুল ওয়াহেদ, নাইরোবি।

২২৩) মাসটার আব্দুল আযীয, সিয়ালকোট।

২২৪)ফাতিমা বিবি, পত্নী মাস্টার আব্দুল আযীয, নওশহরা।

২২৫) আখতার বেগম উরফে ফারখুন্দাহ বিনতে মাস্টার আব্দুল আযীয, সিয়ালকোট।

২২৬)শেখ আব্দুর রশীদ, সদর বাজার মেরঠ।

২২৭) ডক্টর মহম্মদ শের আলি, সিয়ালকোট।

২২৮) শেখ আব্দুল গনী, পেশাওয়ার।

২২৯) ডক্টর গোলাম আলি।

২৩০) জয়নব বেগম, পত্নী ডক্টর গোলাম আলি, শেখুপুরা।

২৩১) সরদার আব্দুর রহমান নওমুসলিম, কাদিয়ান।

২৩২) গোলাম ফাতিমা, পত্নী সরদার আব্দুর রহমান নওমুসলিম, কাদিয়ান।

২৩৩) আযীয বিবি, পত্নী বাবু গোলাম রসূল ঠেকেদার, কাদিয়ান।

২৩৪) চৌধরী নাযীর আহমদ, গুরদাসপুর।

২৩৫) মাস্টার মৌলা বখশ, কাদিয়ান।

২৩৬) রহমত বিবি, পত্নী মাস্টার মৌলা বখশ, কাদিয়ান।

২৩৭) চৌধরী আযম আলি, শেখুপুরা।

২৩৮) নিয়ামত বিবি, পত্নী চৌধুরী নুর আহমদ খান কাদিয়ান।

২৩৯) সিরাজ বেগম, পত্নী ডক্টর বদরুদ্দীন কাদিয়ান।

২৪০) সুফী কারাম ইলাহি, শিমলা।

২৪১) শেঠ আবু বাকার ইউসুফ (জেদ্দা) কাদিয়ান।

২৪২) শেঠ মহম্মদ গউস হায়দ্রাবাদ দক্ষিণ।

২৪৩) হালীমা বেগম, পত্নী শেঠ মহম্মদ গউস হায়দ্রাবাদ দক্ষিণ।

২৪৪) চৌধুরী মহম্মদ যাফরুল্লাহ খান সাহেবের মহিয়সী জননী হোসাইন বিবি,সিয়ালকোট।

২৪৫) হাকীম মহম্মদ উমর, কাদিয়ান।

২৪৬) বাবু মহম্মদ ফাযিল, ফিরোযপুর।

২৪৭) যয়নব বিবি, পত্নী বাবু মহম্মদ ফাযিল, ফিরোযপুর।

২৪৮) চৌধরী গোলাম আহমদ খান, হোশিয়ারপুর।

২৪৯) মালিক ইমামুদ্দীন, সিয়ালকোট।

২৫০) মালিক উমর আলি, রঙ্গর মুলতান।

২৫১) মাস্টার খাইরুদ্দীন, সুপ্রিনটেনডেনট, উর্দু স্কুল।

২৫২) মুযাফফর বেগব বিনতে মির্যা মহম্মদ আশরফ, সাবেক নাযিম জায়েদাদ সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান।

২৫৩) হামীদাতুন নিসা, পত্নী চৌধুরী আবুল হাশিম খান, নাটোর, জেলা রাজশাহী।

২৫৪) মাস্টার ফযলে করীম, হেড মাস্টার রামগড়, লুধিয়ানা।

২৫৫) হাফিয আব্দুল আলি বি এ, শাহপুর।

২৫৬) আব্দুর রহীম, সিয়ালকোট।

২৫৭) মহম্মদ ইসমাইল মোয়াতবর, কাদিয়ান।

২৫৮) যয়নব বেগম, পত্নী মাহমুদ হাসান আই সি এস কালেক্টর।

২৫৯) সৈয়্যদা নুসরাত বানু, বোম্বাই।

২৬০) সর্দার বেগম নও মুসলেমা, জেলা গুজরাত।

২৬১) চৌধরী গোলাম হাসান মুহাজির, কাদিয়ান।

২৬২) চৌধরী আলি আহমদ কোট করম বখশ, সিয়ালকোট।

২৬৩) মেহের আলি, সাব এসিস্ট্যান্ট সার্জেন, বাহাওয়ালপুর।

২৬৪) ডক্টর নাযীর আহমদ খাঁ, হোশিয়ারপুর।

২৬৫) মালিক মহম্মদ ইসমাইল শ্রী গোবিন্দপুরী।

২৬৬) ডক্টর মহম্মদ ইব্রাহিম খান, জলন্ধর।

২৬৭) হাজি বাকাউল্লাহ্, একাউন্ট অফিস, ভোপাল।

২৬৮) আযীযা বেগম, পত্নী বরকত আলি, নাযের সদস আঞ্জুমান আহমদীয়া কাদিয়ান।

২৬৯) রিযিয়া বেগম, সহোদরা মৌলবী মহম্মদ ইয়াকুব, মৌলবী ফাযিল, কাদিয়ান।

২৭০) আনোয়ার বেগম, সহোদরা মৌলবী মহম্মদ ইয়াকুব, মৌলবী ফাযিল, কাদিয়ান।

২৭১) হিকমত বেগম, মাতা আব্দুল মুগনী খান, নাযির সদর আঞ্জুমান আহমদীয়া, কায়েমগঞ্জ, ফারখাবাদ।

২৭২) খান গোলাম মহম্মদ খান, আইসিএস।

২৭৩) চৌধরী দিল মহম্মদ মৌলবী ফাযিল, কাদিয়ান।

২৭৪) মিঞা আল্লা দিত্তা, জম্মু।

২৭৫) চৌধরী নুরুদ্দীন জিলদার চুক, মনটগমারী।

২৭৬) ফিরোয যারগার মরহুম, পেশাওয়ার।

২৭৭) কাযী মহম্মদ রশীদ, ফিরোযপুর।

২৭৮) পীর সালাহুদ্দীন বি.এ,

সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) এর সত্যতার প্রমাণ

-হাফিয সৈয়্যদ রসূল নিয়ায, নাযির নশর ও ইশাআত, কাদিয়ান

হযরত আকদস মহম্মদ (সা.) ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে মুসলমানদের আমলের অবস্থা যখন দুর্বল হয়ে পড়বে, তখন ইসসলামের পতন শুরু হবে। অপরদিকে তিনি মুসলমান জাতিকে এই সুসংবাদও দান করেছিলেন যে, এমন সময় ইসলামের বিজয়ের জন্য আল্লাহ্ তা'লা ইমাম মাহদীকে আবির্ভুত করবেন। সেই মাহদীকে চেনার জন্য আঁ হযরত (সা.) কতিপয় নিদর্শনের উল্লেখ করেছেন যাতে মুসলমান জাতি সেই মাহদীর বয়আত করে আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করতে পারে।

চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের মহা নিদর্শন

ইমাম বাকের তাঁর হাদীসের সংকলন কিতাব সুনান দারে কুতনীতে নিম্নোক্ত হাদীসটি লিপিবদ্ধ করেছেন।

''اِنَّ لِمَهْدِيِّنَا آيَتَيْنِ لَمْ تَكُوْنَا مُنْذُ خَلْقِ
السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ، يَنْكَسِفُ الْقَمَرُ
لِأَوَّلِ لَيْلَةٍ مِّنْ رَمَضَانَ ، وَ تَنْكَسِفُ
الشَّمْسُ فِي النِّصْفِ مِنْهُ، وَلَمْ تَكُوْنَا
مُنْذُ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوَاتِ وَ الْأَرْضَ''

(সুনানে দারে কুতনী, কিতাবুল ঈদাইন, বাব সাফাতু সলাতুল খুসুফ ওয়াল কুসুফ)

অনুবাদ: মহম্মদ বিন আলি বর্ণনা করেন যে রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন: নিশ্চয় আমাদের মাহদীর জন্য দুটি নিদর্শন আছে যা পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি থেকে আজ পর্যন্ত সংঘটিত হয় নি। রমযান মাসের গ্রহণের তারিখগুলির মধ্যে প্রথম রাত্রিতে চন্দ্রগ্রহণ হবে, অপরদিকে সূর্যগ্রহণের তারিখগুলির মধ্যে মধ্যবর্তী দিনটিতে সূর্যগ্রহণ লাগবে। আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি থেকে আজ অবধি এই ঘটনা সংঘটিত হয় নি।

অতীতের ধর্মগ্রন্থগুলিতে এই নিদর্শনের ভবিষ্যদ্বাণী বিদ্যমান। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদেও এই নিদর্শনের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন-

وَخَسَفَ الْقَمَرُ ۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ

এবং চন্দ্রে গ্রহণ লাগিবে, এবং সূর্য ও চন্দ্র উভয়কে (গ্রহণে) একত্রিত করা হইবে।

(আল কিয়ামাহ: ৯-১০)

এছাড়াও মুসলমানদের দুটি প্রধান ফির্কা শিয়া ও সুন্নী উভয়ের গ্রন্থ হাদীসে সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নিদর্শনকে মাহদীর আগমণের লক্ষণ হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে।

সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণের নিদর্শন প্রকাশ

মুসলমানেরা, বিশেষ করে আলেম সম্প্রদায় হযরত মসীহ মওউদ (আ.)কে যখন কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করল, তখন ঐশী সাহায্যের জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অত্যন্ত বিনয়সহকারে আল্লাহ্র কাছে দীর্ঘ দোয়া করলেন।

(নুরুল হক, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-৮, পৃ: ১৮৪)

এই দোয়ার পর এক মাস সময় অতিক্রান্ত হতে না হতেই আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সেই অনুনয়পূর্ণ দোয়া গ্রহণ করে চাঁদ ও সূর্যকে তাঁর সত্যতার স্বর্গীয় সাক্ষী বানিয়ে দেন। ঠিক চতুর্দশ শতাব্দীর শিরোভাগে চন্দ্রগ্রহণের নির্দিষ্ট তারিখে (১৩,১৪,১৫) র মধ্য থেকে প্রথম রাত্রিতে অর্থাৎ ১৩ই রমজান ১৩১১ হিজরী তথা ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ২১শে মার্চ তারিখে চন্দ্র গ্রহণ সংঘটিত হয় এবং সূর্যগ্রহণের জন্য নির্ধারিত তারিখ (২৭,২৮,২৯)এর মধ্যে মধ্যবর্তী তারিখ অর্থাৎ ২৮ রমযান,মোতাবেক ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল তারিখে সূর্যগ্রহণ সংঘটিত হয়। পরের বছর অর্থাৎ ১৮৯৫ সালের এই একই মহান নিদর্শন আমেরিকা তথা পশ্চিম গোলার্ধেও প্রকাশিত হয়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) অত্যন্ত কঠোরভাবে নিজের সত্যতার স্বপক্ষে এই নিদর্শনটি উপস্থাপন করে লেখেন-'এই তেরোশ বছরে অনেকেই মাহদী হওয়ার দাবি করেছে, কিন্তু কারো জন্য এই স্বর্গীয় নিদর্শন প্রকাশিত হয় নি.....। সেই খোদার কসম যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে! তিনি আমার সত্যতার স্বপক্ষে আকাশে এই নিদর্শন প্রকাশ করেছেন..... আমি খানা কাবায় দাঁড়িয়ে হলফ করে বলতে পারি যে এই নিদর্শনের দ্বারা শতাব্দী নির্দিষ্ট হয়ে গেছে। কেননা, এই নিদর্শন চতুর্দশ শতাব্দীতে এক ব্যক্তির সত্যতার জন্য প্রকাশিত হয়েছে। অতএব নির্দিষ্ট হয়ে গেল যে আঁ হযরত (সা.) চতুর্দশ শতাব্দীকে মাহদীর আবির্ভাব কাল হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন।"

(তোহফা গোল্ডবিয়া, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৭, পৃ: ১৪২)

তিনি তাঁর কবিতায় লিখেছেন-

اِسْمَعُوْا صَوْتَ السَّمَآءِ جَآءَ الْمَسِيْح جَآءَ الْمَسِيْح
نیز بشنو از زمیں آمد امامِ کامگار

কাদিয়ানে সূর্যগ্রহণের দৃশ্য

যখন চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের নিদর্শন প্রকাশ পেল, সেদিন বিশেষ করে মক্কাবাসীরা এই ভেবে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন যে এখন ইসলামের উন্নতির যুগ শুরু হল আর ইমাম মাহদী জন্ম গ্রহণ করেছেন। এছাড়াও অন্যান্য মুসলিম দেশেও আনন্দ উদযাপিত হয়। চন্দ্রগ্রহণ সংঘটিত হওয়ার পর সূর্যগ্রহন দেখার জন্য এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে গ্রহণের নামায পড়ার মানসে বেশ কিছু সাহাবা কাদিয়ানে এসেছিলেন। হযরত মির্যা আইয়ুব বেগ সাহেব বলেন-

"রমযান মাসে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণ হওয়ার ভবিষ্যদ্বাণী দারে কুতনী ও ইত্যাদি হাদীস গ্রন্থে মাহদীর লক্ষণ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে। ১৮৯৪ সালের মার্চ মাসে প্রথমে চন্দ্র গ্রহণ হয়; সেই মাসেই যখন সূর্যগ্রহণ হওয়ার দিন ঘনিয়ে আসে, তখন আমরা দুই ভাই হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর সঙ্গে এই ঐশী নিদর্শন দেখার এবং সঙ্গে নামায পড়ার উদ্দেশ্য নিয়ে শনিবার বিকেলে লাহোর থেকে রওনা হই এবং প্রায় রাত এগারোটা নাগাদ বাটালা এসে পৌঁছাই। পরের দিন (৬এপ্রিল) সকাল সকাল গ্রহন অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা। ঝড় বইছিল আর মেঘের গর্জন সহকারে বিদ্যুতের ঝলকানি দেখা যাচ্ছিল। উল্টোদিক থেকে বয়ে আসা ঝড়ে ধুলোবালি চোখে পড়ছিল। ভালভাবে হাঁটা যাচ্ছিল না। বিদ্যুতের ঝলকানিতেই রাস্তা দেখা যাচ্ছিল। সঙ্গে স্বদেশের বন্ধু মৌলবী আব্দুল আলি সাহেবও ছিলেন। সকলে মনস্থির করলেন, যে করেই হোক, আজ রাতেই কাদিয়ান পৌঁছতে হবে। তিন জন মিলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিনয়পূর্ণ এই দোয়া করেন যে হে আল্লাহ! যমীন আসমানের সর্বশক্তিমান খোদা! আমরা তোমার অসহায় বান্দা। তোমার মসীহকে দেখতে যাচ্ছি, আর পায়ে হেঁটে যাচ্ছি। শীতল রাত্রি। তুমিই আমাদের উপর দয়া কর। আমাদের পথ সুগম করে দাও আর উজান হাওয়া দূর করে দাও। দোয়ার শেষ শব্দটুকুও তখনও মুখ থেকে বের হয় নি, এর মাঝে ঝড়ের অভিমুখ বদলে গেল আর সামনের দিক থেকে না এসে আমাদের পিছনের দিক থেকে ঝড় বইতে শুরু করল এবং আমাদের পথ চলতে সহায়কের ভূমিকা নিল। মনে হচ্ছিল, আমরা যেন বাতাসে ভেসে চলেছি। কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা নহর পর্যন্ত পোঁছে গেলাম। এখানে এসে কয়েক পসলা বৃষ্টির সম্মুখীন হলাম। নহর সংলগ্ন একটি ছোট্ট দালান ছিল, আমরা সেখানে প্রবেশ করলাম। সেই সময় গুরুদাসপুর জেলার অধিকাংশ পথে দস্যুবৃত্তির ঘটনা ঘটত। দেশলাই জ্বালিয়ে দেখলাম কোঠি খালি, সেখানে দুটি গোবর ঘুঁটে ও একটি মোটা আকারের ইট পড়ে ছিল। প্রত্যেকে একটি করে নিয়ে মাথার নীচে দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ পর যখন চোখ খুলল, দেখলাম আকাশে তারা ফুটেছে। আকাশ পরিস্কার ছিল আর ঝড় ও মেঘের নাম চিহ্নও ছিল না। এরপর আমরা পুনরায় রওনা হলাম এবং হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর দস্তরখানায় গিয়ে সেহরী করলাম।

সকালে মৌলবী মহম্মদ আহসান সাহেব আমরোহী মসজিদ মুবারকের ছাদে নামায পড়ালেন। আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সঙ্গে সূর্যগ্রহণের নামায পড়লাম। প্রায় তিন ঘন্টা নামায ও

ও ইত্যাদি অব্যাহত থাকল। অনেকে কাঁচের উপর কালি লাগিয়ে রেখেছিল, যার দ্বারা তারা গ্রহণ দেখতে ব্যস্ত ছিল। কেবল একটুখানি কালছায়া কাঁচের উপর পড়েছিল, তা দেখে হযরত মসীহ মও্উদ (আ.) কে কেউ জানাল যে সূর্য গ্রহণ শুরু হয়েছে। তিনি কাঁচের মধ্যে দেখলেন, খুবই সূক্ষ্ম অন্ধকার দেখতে পেলেন। যা দেখে হুযুর (আ.) দুঃখ করে বললেন, এই গ্রহণ আমরা তো দেখলাম, কিন্তু তা এতটাই সূক্ষ্ম যে সাধারন মানুষের দৃষ্টিতে ধরা দিবে না। আর এভাবে এক মহা নিদর্শন সংশয়পূর্ণ থেকে যাবে। হুযুর (আ.) কয়েকবার একথার উল্লেখ করেন। কিছুক্ষণ পর অন্ধকারভাব বাড়তে শুরু করল, এমনকি সূর্যের সিংহভাগ অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। ”

(আসহাবে আহমদ, ১ম খণ্ড, পৃ: ৯২-৯৪, বর্ণনা, হযরত মির্যা আইয়ুব বেগ সাহেব)

সূর্যগ্রহণের নিদর্শন দেখে বয়আত গ্রহণকারী সাহাবাদের ঘটনাবলী।

ইমাম মাহদী (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন হিসেবে এই ভবিষ্যদ্বাণী বেশ বিখ্যাত ও পরিচিত হয়ে উঠেছিল। এই নিদর্শন যখন প্রকাশ পেল, তখন দুর্বৃত্তপরায়ন উলেমারা নিজেদের স্বভাব অনুযায়ী প্রত্যাখ্যান করল আর সাধারণ মুসলমানকে সত্য গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখার যথাসাধ্য চেষ্টা করল। কিন্তু হাজার হাজার পুণ্যবান মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণের সৌভাগ্য অর্জন করল। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন:

“ আমার জন্য চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণের নিদর্শন প্রকাশ পেল আর হাজার হাজার মানুষ এই নিদর্শন দেখে আমার জামাতের সামিল হল। চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ আমার জন্য আনন্দ বয়ে এনেছে আর বিরুদ্ধবীর জন্য লাঞ্ছনা। তারা কি হলফ করে বলতে পারে যে, এমন সময় যখন কিনা আমি প্রতিশ্রুত মাহদী হওয়ার দাবি করছি, তারা কি মন থেকে মেনে নিত যে তখন সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ হোক আর আরব দেশসমূহে এর চিহ্ন মাত্র প্রকাশ না পাক। আর যখন তাদের ইচ্ছের বিপরীতে সেই নিদর্শন প্রকাশ পেল, তখন নিশ্চয় তারা মর্মাহত হয়েছে এবং এতে নিজেদের অপমান দেখেছেন।”

(আনোয়ারুল ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৩)

এই অসাধারণ নিদর্শন দেখে আহমদীয়াত গ্রহণকারী পুণ্যবানদের অনেক ঘটনা রয়েছে। দুটি ঘটনার উল্লেখ করা হল।

১) হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন-

“অনেক দিনের কথা। সম্ভবত ১৯৬৬ সালের ঘটনা এটি। ওয়াকফে আরযি সূত্রে সরগোধা অঞ্চলের এক প্রত্যন্ত গ্রামে যাওয়ার সুযোগ হয়। সেখানে এক পৌঢ়ার সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়। আমি নিজের আহমদী পরিচয় দিয়ে জানাই যে রাবোয়া থেকে আসছি। তখন সেই বৃদ্ধাও জানায় যে সেও আহমদী। তারা সেই যুগে চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের নিদর্শন দেখে আহমদী হয়েছিলেন। তিনি বলেন, আমি তখন ছোট ছিলাম, আমার বাবা-মা সেই সময় জীবিত ছিলেন। সেই বন্য অঞ্চলে, প্রত্যন্ত গ্রামে নিরক্ষর মানুষগুলোও চাঁদ ও সূর্যের গ্রহণ দেখে আহমদী হয়েছিলেন। আল্লাহ্ তা’লা সেই যুগেও অনেককে এই নিদর্শনের মাধ্যমে হিদায়াত দিয়েছিলেন।”

(খুতবা জুমআ, প্রদত্ত, ৩০ শে জুন, ২০০৬)

২) “হযরত গোলাম মহম্মদ সাহেব (রা.) বর্ণনা করেন, এই অধমের গ্রামে অনেক দিন আগে বদরুদ্দীন সাহেব নামে এক মৌলবী ছিলেন। সেই সময় তাঁর বয়স প্রায় পনেরো বছর ছিল। বান্দা মৌলবী বদরুদ্দীন সাহেবের বাড়ির সামনে তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে ছিল, এমতাবস্থায় সূর্যকে গ্রহণ লাগে আর মৌলবী সাহেব বলে ওঠেন সুবহানাল্লাহ। মাহদী সাহেবের লক্ষণ প্রকাশিত হল এবং তাঁর আগমণের সময় হল। কিছুলকাল পরে মৌলবী সাহেব আহমদী হয়ে যান। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠাবান ও পুণ্যবান ছিলেন। এক বছরের প্রচেষ্টায় তিনি নিজের স্ত্রী ও পিতামাতাকে আহমদী করেন।”

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত ২০ শে মার্চ, ২০১৫)

চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের নিদর্শনকে অস্বীকার করা খোদার শাস্তিকে আহ্বান করার নামান্তর

এই মহা নিদর্শন প্রকাশিত হওয়া প্রায় ১২৫ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আজও মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীরা এখনও প্রতিশ্রুত পুরুষের (   ) প্রতীক্ষায় রয়েছে। অতএব খোদার এই প্রত্যাদিষ্ট পুরুষকে প্রত্যাখ্যান করা খোদার শাস্তিকে আহ্বান করার নামান্তর। হযরত আমীরুল মোমেনীন খলীফাতুল মসীহ খামিস (আই.) বলেন- “যখন এই নিদর্শনাবলী পূর্ণ হচ্ছে, তখন মসীহ মওউদ এর আগমণের প্রতীক্ষা এখনও কেন? মসীহকে কেন কিয়ামতের সঙ্গে যোগ করার চেষ্টা করা হয়? কেবল একটিই জেদ ধরে বসে থাকা! আল্লাহই এদের বিবেক দিন। এছাড়াও একটি হাদীসে বর্ণিত আছে যে মসীহর আগমণের নিদর্শন হিসেবে, আর এটি এমন হাদীস যখন আহমদীরা সেটি উপস্থাপন করে, এটিকে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হয় না। আর সেটি হল সূর্য ও চন্দ্র গ্রহণ সংক্রান্ত হাদীস। আর এই নিদর্শনকে আমরা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করে থাকি।....

একটি জলজ্যান্ত নিদর্শন যেটিকে চ্যালেঞ্জ হিবেবে উপস্থাপন করা হয়, ইমাম বাকের যার ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন, মসীহ মওউদ এর যুগে চন্দ্র ও সূর্য গ্রহণ সংঘটিত হওয়া নির্ধারিত ছিল। তা সত্ত্বেও মসীহ মওউদ এর আগমণের সময় এখনও হয়নি বলে দাবি করা খোদার শাস্তিকে আহ্বান করার নামান্তর।”

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ৩রা ফেব্রুয়ারী, ২০০৬)

দোয়া করি, আল্লাহ্ তা’লা মুসলমান জাতি ও অন্যান্য ধর্মানুসারীদেরকেও এই মহা নিদর্শনকে অনুধাবন করার এবং জগতের সকল জাতির প্রতিশ্রুত পুরুষকে গ্রহণ করার তৌফিক দিন। আমীন।

|*|****|***

১১ পাতার শেষাংশ....

ফিরোযপুর।

২৭৯) ওয়ালদা মাসউদ আহমদ অমৃতসরী।

২৮০) হামশীরা মাসউদ আহমদ অমৃতসরী।

২৮১) সাঈদা বেগম, বিনতে শেঠ মহম্মদ গউস, হায়দ্রাবাদ দক্ষিণ।

২৮২) সেলিমা বেগম, বিনতে শেঠ মহম্মদ গউস হায়দ্রাবাদ।

২৮৩) আমাতুল হাফীয বেগম, বিনতে শেঠ মহম্মদ গউস হায়দ্রাবাদ।

২৮৪) শেঠ মহম্মদ আজম হায়দ্রাবাদ।

২৮৫) আযীযা বেগম, এহলিয়া শেঠ মহম্মদ গউস হায়দ্রাবাদ।

২৮৬) আমাতুল হাঈ বেগম, বিনতে শেঠ মহম্মদ গউস হায়দ্রাবাদ।

২৮৭) মাহমুদা বেগম, এহলিয়া মহম্মদ মঈনুদ্দীন হায়দ্রাবাদ।

২৮৮) আব্দুল আযীয চুক সিকান্দর, জেলা গুজরাত।

২৮৯) ডক্টর নযীর আহমদ, পিতা সরদার আব্দুর রহমান আফ্রিকা।

২৯০) মহম্মদ বখশ আহমদী সোনোর রিয়াসত, পাটিয়ালা।

২৯১) চৌধরী করীমুদ্দীন ভট্টি, সিয়ালকোট।

২৯২) মহম্মদ শফী, সিয়ালকোট।

২৯৩) আল্লাহ জোয়ায়া আহমদী, সাকিন চিনৌট, হাল আগ্রা, বয়আত ১৯১৩ খৃ:।

২৯৪) মরিয়ম খাতুন, যাওজা মৌলবী আল্লাহ্ দিত্তা সাহেব মরহুম জম্মু, মুহাজির কাদিয়ান।

২৯৫) সর্দার বশারত আহমদ আফ্রিকা, ইবনে মাস্টার আব্দুর রহমান সাহেব বিএ কাদিয়ান।

২৯৬) ডক্টর মহম্মদ ফাতেহুদ্দীন আহমদী, কাদিয়ানী।

২৯৭) মরিয়ম শাহ নওয়ায খাঁ, বিনতে মিঞা আব্দুর রাজ্জাক সিয়ালকোটী।

২৯৮) বিবি নাসীমা খাতুন, জেদ্দাহ মোহতরমা হযরত সারা বেগম (রা.), ভাগলপুর, বিহার।

২৯৯) শেখ আব্দুল্লাহ্ স্কটল্যান্ড।

৩০০) আযীয বানু বিনতে মুনশী ফায়ায আলি, মেরঠ।

৩০১) বাবু খুশি মহম্মদ, গুজরাঁওয়ালা।

৩০২) নুসরাত সুলতানা বেগম সাহেবা গুজরাতী সুম্মা লাহোরী।

৩০৩) মুনশী আব্দুল করীম, নওশহরা, সিয়ালকোট ।

৩০৪) সৈয়্যদ মহম্মদ হোসেন শাহ, ওয়ালদ আতা মহম্মদ শাহ মুখতারে আম সাহেবযাদগান মসীহে মওউদ (আ.), ওয়ালদ ডক্টর মহম্মদ জি আহমদী।

৩০৫) ক্যাপ্টেন ডক্টর মহম্মদ জি আহমদী ওয়ালদ সৈয়্যদ হোসেন শাহ মেডিক্যাল অফিসার নানকানা সাহেব, শেখুপুরা।

৩০৬) বরকাতুন নিসা বেগম, পত্নী সৈয়্যদ মহম্মদ হোসেন শাহ, ওয়ালদ আতা মহম্মদ শাহ মুখতারে আম সাহেবযাদগান মসীহে মওউদ (আ.), ওয়ালদ ডক্টর মহম্মদ জি আহমদী।

****

হযরত মসীহ মওউদ এর সপক্ষে

(আরবী) বাক্যরচনা ও ধর্মীয় তর্কযুদ্ধের সময় ঐশী সাহায্য ও সমর্থনের ঈমান উদ্দীপক ঘটনা

–তানভীর আহমদ নাসের, সহ–সম্পাদক, বদর পত্রিকা (উর্দু সংস্করণ)

হযরত মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব সিয়ালকোটী (রা.) তাঁর রচনা "সীরাত হযরত মসীহ মওউদ (আ.)" পুস্তকে হযরত মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ সাহেব আল মুসলেহ মওউদ (রা.)–এর শৈশবের একটি বিচিত্র ঘটনা বর্ণনা করে লেখেন–

" মাহমুদ চার বছরের এক শিশু ছিল। হযরত (হযরত মসীহ মওউদ–অনুবাদক) রীতিমত ভিতরে বসে লিখছিলেন। মিঞা মাহমদ দেশলাই নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। তাঁর সঙ্গে অন্যান্য শিশুদের একটা দলও ছিল। প্রথমে তারা কিছুক্ষণ খেলতে থাকে, ঝগড়া করতে থাকে। তারপর যা কিছু মনে এল, তারা সেই সব কাগজ পত্রে আগুন ধরিয়ে দেয়। তা দেখে সে আনন্দে হাততালি দিতে শুরু করে। অন্যদিকে হযরত সাহেব লেখায় ব্যস্ত আছেন, মাথা তুলে দেখছেনও না যে কি হচ্ছে। ততক্ষণে আগুন নিভে গেছে আর মূল্যবান কাগজপত্র পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। শিশুরা অন্য কোনও খেলায় আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। এরই মধ্যে পরের লেখাগুলি মিলিয়ে দেখতে পূর্বের কোনও কাগজ দেখার প্রয়োজন দেখা দিল। একে জিজ্ঞেস করেন সে চুপ, ওকে জিজ্ঞাসা করেন সেও চুপ করে থাকে। অবশেষে একটি শিশু বলে ফেলল, মিঞা সাহেব কাগজ পুড়িয়ে দিয়েছে। বাড়ির মহিলারা ও অন্য সকলে আশ্চর্য ও ভয় বিহ্বল হয়ে পড়ল যে এখন কি হবে!.... কিন্তু হযরত সাহেব মৃদু্য হেসে বললেন, বেশ হয়েছে। এর মধ্যে নিশ্চয় আল্লাহ্র কোন প্রজ্ঞা ছিল, আর খোদা তা'লা চান এখন এর থেকে ভাল কোন প্রবন্ধ আমাকে শেখাতে। "

(সীরাত হযরত মসীহ মওউদ, পৃ: ২৩, কানাডা থেকে প্রকাশিত)

এই ঘটনা থেকে আমরা একদিকে যেমন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর এক অপরূপ সুন্দর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের ক্ষমাসুলভ আচরণ সম্পর্কে জানতে পারি, তেমনি এও জানতে পারি, যে জ্ঞানের নদী তাঁর দ্বারা প্রবাহমান হয়েছিল, তা খোদা এক বিশেষ প্রজ্ঞার অধীনে নিজ সন্নিধান থেকে তাঁকে দান করেছিলেন। যে যুগে তাঁর আবির্ভাব ঘটেছিল, সেই সময় ইসলাম চতুর্দিক থেকে শত্রুদের অভিযোগ ও আপত্তির চক্রব্যূহে ঘেরা ছিল। বিশেষ করে খৃষ্টান ও আর্যসমাজীরা অত্যন্ত জঘন্য ও উস্কানিমূলক লেখনী ইসলামের বিরুদ্ধে প্রকাশ করছিল। এই অবস্থা দেখে তাঁর হৃদয় আকুল হয়ে উঠত। তাঁর ব্যকুলতা অনুমান করা যায় তাঁর দোয়া থেকে। তিনি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করতেন, 'হে খোদা! আমার মুখে এমন কথা জোগাও, আমাকে এমন বাকশক্তি দাও যা অন্তরে জ্যোতি সঞ্চার করে এবং স্বীয় সঞ্জীবনী শক্তি দ্বারা তাদের বিষকে দূর করে।"

(শাহাদাতুল কুরআন, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ৩৯৮)

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর দোয়াকে গ্রহণীয়তার মর্যাদা দান করেন, তাঁর অনুনয় বিনয় শোনেন এবং ইসলামের শত্রুদের আপত্তিসমূহের সপাটে উত্তর দেওয়ার জন্য আরবী, ফার্সি এবং উর্দু ভাষায় পূর্ণ দক্ষতা দান করলেন। এবং এগুলিকে তাঁর পূর্ণ আনুগত্যকারী বানিয়ে দেন। তাঁকে এই শক্তি দক্ষতা দেওয়া হল যে, তিনি যে কোন বিষয়ে অনায়াসে যুক্তি প্রমাণ ভিত্তিক প্রবন্ধ রচনা করতে পারেন আর যে ভাষাতেই লিখতেন, সেই ভাষার যথোপযুক্ত শব্দ যথাস্থানে মুক্তোর সারির ন্যায় সারিবদ্ধ করে সাজিয়ে লিখতেন। বাক্যরচনায় তিনি খোদা তা'লার পক্ষ থেকে অদৃশ্য থেকে সাহায্য ও সমর্থন লাভ প্রসঙ্গে বলেন–

"আমি বাক্যগঠনের সময়ও আমার জন্য খোদা তা'লার অলৌকিক নিদর্শন বিশেষরূপে প্রকাশ পেতে দেখি। কেননা, আমি উর্দু কিম্বা আরবীতে যখন কোন বাক্য লিখি, তখন অনুভব করি, কেউ আমাকে ভেতর থেকে শিক্ষা দিচ্ছে আর আমার লেখনী আরবী হোক, উর্দু হোক কিম্বা ফার্সি হোক, সব সময় তা দুইভাবে বিভক্ত হয়।

১) প্রথমত অনায়াসে শব্দাবলী এবং এর অর্থ আমার সামনে ভেসে ওঠে, যেগুলিকে আমি অবিরামভাবে লিখতে থাকি; সেই লেখাগুলিতে আমাকে যেন কোন পরিশ্রমই করতে হয় না। .... ২) আমার লেখনীর দ্বিতীয় অংশ শুধুমাত্র অলৌকিক নিদর্শন হিসেবে রয়েছে। যেমন, যখন আমি একটি আরবী লেখা লিখছি, আর লেখার ছন্দে এমন কিছু শব্দের প্রয়োজন দেখা দেয় যা আমার জানা নেই, তখন সেগুলি সম্পর্কে খোদা তা'লার ওহী পথপ্রদর্শন করে আর সেই শব্দ নিলম্বিত ওহীর ন্যায় রুহুল কুদুস আমার অন্তরে সঞ্চার করে আর তা আমার মুখ দিয়ে উচ্চারিত হয়। .... যেমন আরবী লেখার ধারাবাহিকতায় আমার একটি শব্দের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল যা একেবারে '***বাসা ইয়ারী আইয়াল***' এর অনুবাদ ছিল আর যা আমার জানা ছিল না। এই লেখার ধারাবাহিকতায় এর প্রয়োজন ছিল। তৎক্ষণাৎভাবে আমার হৃদয়ে নিলম্বিত ওহীর ন্যায় 'যাফাফ' শব্দটি সঞ্চার করা হল, যার অর্থ '***বাসা ইয়ারী আইয়াল***' (আরবী শব্দ)। উদাহরণ স্বরূপ আরও বলা যায় যেমন, লেখনীর ধারাবাহিকতায় আমার এমন শব্দের প্রয়োজন হয়েছে, যার অর্থ দুঃখ ও ক্রোধে নীরব হয়ে যাওয়া আর সেই শব্দটি আমার জানা ছিল না। তৎক্ষণাৎ আমার মনে সঞ্চার করা হল 'ওয়াজুম'। অনুরূপ ঘটনা আরবী বাক্য গঠনের সঙ্গেও ঘটেছে। আরবী লেখার সময় শত শত তৈরী করা বাক্য মুতলবী ওহীর ন্যায় আমার হৃদয়ে প্রবেশ করে। কিম্বা কোনও ফিরিশতা এক টুকরো কাগজে লিখে সেই বাক্যটি দেখিয়ে দেয়। অনেক বাক্য কুরআনের আয়াত হয়ে থাকে কিম্বা সেগুলির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ যৎসামান্য পরিবর্তন সহকারে হয়ে থাকে........। অতএব, এটিই সেই গোপন রহস্য, যার কারণে আমি পুরো জগতকে অলৌকিক বাগ্মিতাপূর্ণ আরবী তফসীর লেখার প্রতিযোগিতার জন্য আহ্বান করে থাকি। অন্যথায় মানুষের কি সাধ্য যে এমন দর্প নিয়ে সে পুরো জগতকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আহ্বান জানায়?"

(নুযুলুল মসীহ, রূহানী খাযায়েন, খন্ড–১৮ , পৃ: ৪৩৪–৪৩৬)

যুগের আলেমদেরকে লিখিত তর্কযুদ্ধের আহ্বান এবং মহান ঐশী সাহায্য ও সমর্থন

১৮৯১ সালের ২৬ শে মার্চ হযরত মসীহ মওউদ (আ.) লুধিয়ানা থেকে একটি ইশতেহারের মাধ্যমে সকল প্রখ্যাত আলেমদেরকে লিখিত মোবাহাসার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে লেখেন, ' আমার দাবি মোটেই আল্লাহ্ ও তাঁর রসুলের বাণীর বিরুদ্ধে নয়। যদি ভদ্রজনেরা স্থান ও দিনক্ষণ নির্ধারণ করে একটি সর্বজনীন জলসায় আমার সঙ্গে লিখিত বাহাস না করেন, তবে আপনারা খোদা

তা'লা এবং সত্যবাদী বান্দাদের দৃষ্টিতে বিরুদ্ধবাদী প্রতিপন্ন হবেন।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) এর এই ইশতেহার পড়ে এমনিতে কেউ প্রকাশ্য প্রতিদ্বন্দ্বিতায় এগিয়ে এল না। কিন্তু মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী একথা বলতে শুরু করল যে, মির্যা সাহেবের উচিত আমার সঙ্গে মোবাহাসা করা। এই মোনাযারা লেখনী আকারে ছিল আর ২০ থেকে ২৯ জুলাই ১৮৯১ পর্যন্ত অর্থাৎ দশদিন যাবত চলতে থাকে। হযরত আকদস (আ.) মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবীর সঙ্গে মোবাহাসা শুরু করেন। মোবাহাসা শুরু হলে হযরত মসীহ মওউদ (আ) বুখারী শরীফ রেখে কলম নিয়ে লিখতে থাকেন, আর যখন কোন প্রবন্ধ লেখা শেষ হয়ে যেত, তখন সেটি পড়ে শুনিয়ে দেওয়া হত। কিন্তু অপরদিকে মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী অতিকষ্টে নিজের লেখা প্রস্তুত করত এবং তা পড়ে শোনাত।

একটি অলৌকিক নিদর্শন: (হযরত পীর সিরাজুল হক সাহেবের পক্ষ থেকে বর্ণিত হয়েছে) এই মোবাহাসা চলাকালীন মৌলবী মহম্মদ হোসেন সাহেব বাটালবী বুখারীর একটি উদ্ধৃতি জানতে চান। সেই সময় হযরত আকদস (আ.) এর স্মরণে ছিল না। আর তাঁর খাদেমদের মধ্যেও কারো সেটি স্মরণে ছিল না। কিন্তু হযরত আকদস (আ.) বুখারী শরীফ চেয়ে পাঠান এবং এর পৃষ্ঠা ওলটাতে শুরু করেন। শেষে এক স্থানে পৌঁছে তিনি থেমে গিয়ে বলেন, 'নাও, দেখে নাও।' সমস্ত শ্রোতারা আশ্চর্য হন যে, ব্যাপারাটা কি? কেউ হযরত আকদসকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, 'আমি হাদীস গ্রন্থ হাতে নিয়ে যখন পাতা ওলটাতে শুরু করলাম, তখন মনে হল যেন বইয়ের সমস্ত পৃষ্ঠা-ই সাদা, তাতে কিছুই লেখা নেই। সেই কারণে আমি দ্রুত পৃষ্ঠা ওলটাতে থাকি। শেষে আমি একটি পৃষ্ঠা পেলাম যেখানে কিছু লেখা ছিল। আমার বিশ্বাস জন্মাল যে, এটিই সেই উদ্ধৃতি যা আমার প্রয়োজন। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা এমন অলৌকিক ক্রিয়া দেখালেন যে, যেখানে উদ্ধৃতিটি লেখা ছিল- সেই জায়গাটি ছাড়া সমস্ত পৃষ্ঠা সাদা মনে হল।'

(তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪০৮)

এই মোবাহাসায় মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী অত্যন্ত ধূর্ততার পরিচয় দেয়। কিন্তু সেগুলি তার নিজের দিকেই ব্যুমেরাং হয়ে ফিরে যায়। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) তাকে কুরআন করীমের দিকে নিয়ে আসতেন, কিন্তু সে নিজেকে বাঁচাতে হাদীসের দিকে পলায়ন করত। মূল বিতর্কের বিষয় ছিল 'ঈসা (আ.)-এর জীবন ও মৃত্যু। কিন্তু সে এটিকে এড়িয়ে যেতে থাকে। শেষের দিন হযরত মসীহ মওউদ (আ.) যখন নিজের লেখা পড়ে শোনাতে শুরু করেন, তখন মৌলবী সাহেবের মুখমণ্ডল বিষন্ন হয়ে পড়ে আর এতটাই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে এবং হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে যে, লেখার জন্য যখন কলম তুললেন, তা মাটিতে আঘাত করতে থাকলেন, আর দোয়াত যথাস্থানেই পড়ে রইল। আর কলমটি বার বার মাটিতে আঘাত খেয়ে শেষে ভেঙ্গেই গেল। আর যখন এই হাদীস শোনানো হল যে রসুলুল্লাহ্ (সা.) বলেছেন, যে হাদীস কুরআনের সঙ্গে সাংঘর্ষিক হয়, সেটি পরিত্যাজ্য আর কুরআন স্বীকার্য', তখন মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী ভয়ানক রেগে গিয়ে বললেন, এই হাদীস বুখারীতে নেই। আর যদি এই হাদীস বুখারীতে থাকে, তবে আমার দুই স্ত্রীকে তালাক। তালাক শব্দ শুনে উপস্থিত সকলে হাসিতে ফেটে পড়েন আর মৌলবী সাহেব কোনও ক্রমে নিজের লজ্জা সংবরণ করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আর পরে বেশ কয়েক দিন পর্যন্ত মৌলবী সাহেব লোকদের বলতে থাকেন, না, না, আমার স্ত্রীদের তালাক হয় নি। আর আমি তালাক শব্দ উচ্চারণও করিনি। প্রথমে জনা কয়েক লোক এ সম্পর্কে জানত, কিন্তু এখন মৌলবী সাহেব নিজেই হাজার হাজার মানুষকে এ সম্পর্কে জানিয়ে দিলেন। মুবাহাসা সম্পন্ন হওয়ার বেশ কয়েক মাস পর, দিল্লীতে একটি জলসা অনুষ্ঠিত হল, যেখানে অনেক আলেম মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবীর প্রবল সমালোচনা করে বললেন, তুমি মির্যা সাহেবের সঙ্গে লুধিয়ানায় যে মুবাহাসা করেছ, তাতে তুমি কি করতে পেরেছ? মূল বাহাস তো কিছুই হয় নি। বাটালবী সাহেব উত্তর দেন, 'মূল বিতর্কের বিষয়ে কিভাবে আসতাম? এ সম্পর্কে তো আমার জানাই নেই। কুরআন শরীফে ঈসা (আ.)এর জীবন কিম্বা আকাশে উত্তোলনের বিষয়ে কিছুই উল্লেখ করা হয় নি। হাদীসসমূহ থেকে কেবল নুযুল বা অবতরণ প্রমাণিত হয়, ব্যস এতটুকুই। আমি মির্যা সাহেবকে হাদীসের দিকে টেনে নিয়ে আসতাম আর তিনি আমাকে কুরআনের দিকে নিয়ে যেতেন।'

(তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪১০)

বাক্যগঠনের মহান নিদর্শন

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) নিজের দাবির প্রচার ও প্রসারের জন্য দিল্লীতেও যান। ১৮৯১ সালের ২৯ শে ডিসেম্বর তিনি দিল্লীতে পৌঁছে মহল্লা বেলিমারাঁ স্থিত নওয়াব লোহারুর দ্বিতল কোঠিতে অবস্থান করেন এবং সৈয়্যদ নাযীর হোসেন সাহেব দেহেলবী ও শামসুল উলেমা মৌলবী আব্দুল হক সাহেবকেকে ঈসা (আ.)-এর মৃত্যর বিষয়ে লিখিত মোবাহাসার আহ্বান জানান। মৌলবী আব্দুল হক সাহেব নিজের অপারগতা জানান, কিন্তু মৌলবী নাযীর হোসেন দেহেলবী মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবীর প্ররোচনায় মোবাহাসার জন্য প্রস্তুত হন। এরপর মৌলবী মহম্মদ হোসেন বাটালবী ও তাঁর সাঙ্গাপাঙ্গাদের ষড়যন্ত্র কিভাবে সীমা ছাড়িয়ে যায় আর কিভাবে খোদার সিংহ দিল্লীর জামে মসজিদে মৌলবী নাযীর হোসেনের সামনে গর্জে ওঠেন, সে সম্পর্কে তারিখে আহমদীয়াতে একটি পূর্ণ অধ্যায় রচিত হয়েছে। মৌলবী নাযীর হোসেন সাহেব কোনক্রমে এই মোবাহাসার তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ থেকে রক্ষা পান, কিন্তু মৌলবী মহম্মদ বশীর সাহেব মোবাহাসার জন্য সাড়ম্বরে উপস্থিত হন। ১৮৯১ সালের ২৩ শে অক্টোবার মোবাহাসা আরম্ভ হয়।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) মোবাহাসা আরম্ভের পূর্বে নিজের দাবি সম্পর্কে মৌলবী বশীর মহম্মদ সাহেব এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে সম্বোধন করে একটি পরিচিতি মূলক বক্তব্য প্রদান করেন। হুযুর (আ.) বক্তব্য দিচ্ছিলেন, মাঝখান থেকে মৌলবী মহম্মদ বশীর সাহেব বলে বসেন, 'আপনি অনুমতি দিলে আমি বারান্দা অপর কোণে বসে কিছু লিখতে চাই। হযরত আকদস বলেন, বেশ! মৌলবী সাহেব বারান্দার সেই কোণে গিয়ে বসেন এবং বাড়ি থেকে নিয়ে আসা প্রবন্ধটির অনুলিপি তৈরী করতে থাকেন। অথচ শর্ত ছিল কেউ নিজের পূর্বের কোন প্রবন্ধ লিখবে না, বরং যা কিছু লেখার তা তর্কসভাতে বসেই লিখতে হবে। এই বিরুদ্ধাচরণের ফলে মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব বললেন, এ তো শর্ত বিরুদ্ধ। পীর সিরাজুল হক সাহেব নোমানী হযরত আকদস (আ.) এর কাছে নিবেদন করলেন, হুযুর যদি অনুমতি দেন, তবে মৌলবী সাহেবকে বলে দিই, আপনি লিখেই তো এনেছেন, সেটিই দিয়ে দিন, যাতে এর উত্তর দেওয়া যায়। হযরত আকদস না চাইতেও এর অনুমতি দিলেন। তিনি দাঁড়িয়ে বললেন, মৌলবী সাহেব লিখে নিয়ে আসা প্রবন্ধ নতুন করে লেখানোর প্রয়োজন কি? তাতে দেরী হয়। লিখে আনা

প্রবন্ধ দিয়ে দিন, যাতে এদিক থেকে দ্রুত উত্তর লেখা সম্ভব হয়। মৌলবী সাহেব একথা শুনে ঘাবড়ে গিয়ে উত্তর দিলেন, না, না! আমি প্রবন্ধ লিখে তো নিয়ে আসি নি, শুধু নোট করে এনেছিলাম, যেগুলিকে বিস্তারিতভাবে লিখছি। অথচ তিনি অবিকল সেই প্রবন্ধটিই লেখাচ্ছিলেন। এর উত্তরে পীর সাহেব কিছু একটা বলতে চাইলেন, কিন্তু হযরত আকদস তাঁকে নিরস্ত করলেন। “মৌলবী সাহেব প্রবন্ধটি দিলে আমার কাছে যেন পাঠিয়ে দেওয়া হয়,” হুযুর মুনশী যাফর আহমদ সাহেবকে একথা বলে বিশ্রামাগারের দিকে প্রস্থান করলেন। মৌলবী সাহেব প্রবন্ধটি দিলে মুনশী সাহেব সেটি নিয়ে হুযুর আকদসের সমীপে উপস্থাপন করেন। হযরত আকদস মৌলবী সাহেবের প্রবন্ধটির উপর আদ্যপান্ত দ্রুত চোখ বুলিয়ে এর উত্তর লিখতে শুরু করলেন। যখন প্রবন্ধের দুটি পৃষ্ঠা লেখা সম্পূর্ণ হল, তখন হুযুর মুনশী যাফর আহমদ সাহেবকে নীচে নকল করার জন্য দিয়ে আসলেন। একটি করে পৃষ্ঠা নিয়ে মৌলবী আব্দুল করীম সাহেব এবং আব্দুল কুদুসসাহেব লিখতে শুরু করেন। এইভাবেই মুনশী সাহেব হযরত সাহেবের লেখা নিয়ে আসতেন আর এঁরা দুজনে মিলে লিখতে থাকতেন। হযরত আকদস এত দ্রুত লিখছিলেন যে আব্দুল কুদুস সাহেব একজন দ্রুত লিপিকার হওয়া সত্ত্বেও তিনি আশ্চর্য হচ্ছিলেন। তিনি হুযুরের লেখনীর উপরে আঙুলের ডগা দিয়ে পরীক্ষা করে দেখতে লাগলেন যে এটি আগেকার লেখা নয় তো? মুনশী যাফর আহমদ সাহেব বললেন, যদি এমন হয় তবে তা এক অসাধারণ নিদর্শন হবে যে উত্তর আগে থেকেই লেখা আছে। হযরত আকদস (আ.) এর এমন বিস্ময়কর লেখনী শক্তি দেখে মৌলবী মহম্মদ বশীর সাহেব হুযুরের নিকট এই অনুরোধ করতে বাধ্য হন যে ‘আপনি অনুমতি দিলে কাল আমি নিজের ঘর থেকেই উত্তর লিখে নিয়ে আসি। হুযুর (আ.) অবিলম্বে অনুমতি দিয়ে দেন। মোবাহাসা শেষ হওয়া পর্যন্ত মৌলবী সাহেব এই পন্থায় অবলম্বন করেন। তিনি হযরত আকদসের কাছ থেকে প্রবন্ধ প্রাপ্তির পর তাঁর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে প্রবন্ধ লিখে আনতেন। তিনি সামনা সামনি বসে কোন প্রবন্ধ লেখেন নি। এই মোবাহাসার ধারাবিবরণী ‘আল হক দেহলী’ নামে প্রকাশিত হয়েছে।’

(তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪২১-৪৩২)

এক রাতে আরবী ভাষার চল্লিশ হাজার ধাতুর জ্ঞান লাভ।

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) ১৮৯৩ সালে আয়েনায়ে কামালাতে ইসলাম পুস্তক রচনা করেন যাতে একাধিক মোবাহাসা যেমন, জীবন, মৃত্যু, খোদার সঙ্গে সাক্ষাত, রুহুল কুদুস এর নিরন্তর সঙ্গলাভ এবং ফিরিশতা ও জিনদের অস্তিত্বের প্রমাণের উপর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোকপাত করেছেন। ১৮৯৩ সালের জানুয়ারী মাসে যখন পুস্তকের উর্দু অংশ সম্পাদিত হল, তখন মৌলানা আব্দুল করীম সাহেব সিয়ালকোটী এক সভায় হযরত আকদসের নিকট নিবেদন করেন যে, এই পুস্তকের সঙ্গে মুসলমান ফকির ও পীরযাদাদের উপর ‘হুজ্জত’ পূর্ণ করার জন্য একটি পত্রও প্রকাশিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। হুযুর (আ.) এই প্রস্তাবটি তাঁর পছন্দ হয়। তাঁর ইচ্ছে ছিল পত্রটি তিনি উর্দুতে লিখবেন। কিন্তু রাত্রিতে কিছু ইলহামী ইঙ্গিতে তিনি আরবী লেখার প্রণোদনা লাভ করেন। আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করলে তাঁকে এক রাতের মধ্যেই আরবীর চল্লিশ হাজার ধাতু শিখিয়ে দেওয়া হয়। তিনি সেই ইলহামী শক্তিতে বলীয়ান হয়েই ‘আত তবলীগ’ নামে বাগ্মীতাপূর্ণ আরবীতে একটি পত্র লেখেন। উক্ত পত্রে তিনি ভারত, আরব, ইরান, তুরস্ক, মিশর এবং অন্যান্য দেশের পীরযাদা, সিজদানশীন, সাধক, সুফি এবং খানকাহনশীদের কাছে সত্যের বাণী পৌঁছে দেন। ‘আততবলীগ’ এর পর আরবী ভাষায় হুযুর (আ.) সেই যুগান্তকারী পুস্তক রচনা করেন যা বাগ্মী আরব সহ অনারবরা নির্বাক বিস্ময়ে অভিভূত হল। ‘আততাবলীগ’ সম্পর্কে এক আরব ফাযিল বলেন, ‘এটি পড়ে এমন ভাবাবেশ সৃষ্টি হল যে মনে হল মাথার ভরে নৃত্য করতে করতে কাদিয়ান পৌঁছে যাই। তারাবলিসে এক প্রখ্যাত আলিম সৈয়্যদ মহম্মদ সাঈদী শামী এই পত্র পাঠ করেই অবলীলায় বলে ওঠেন, ‘খোদার কসম! এমন রচনা কোন আরব বাসী লিখতে পারে না। অবশেষে তিনি এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েই আহমদীয়াত গ্রহণ করেন। হযরত আকদস বলতেন, ‘আমার যতগুলি আরবী রচনা আছে, সেগুলিই সবই ইলহাম দ্বারা প্রাপ্ত, কেননা সেগুলি সব খোদা তা’লার বিশেষ সমর্থনে লেখা হয়েছে। অনেক সময় কিছু শব্দ ও বাক্য লিখে ফেলি, কিন্তু সেগুলির অর্থ আমার জানা থাকে না। লেখার পর অভিধান দেখে এর অর্থ উদ্ধার করি।

এই পুস্তকগুলির নিদর্শনসুলভ রূপ দেখে বিরুদ্ধবাদী উলেমারা বিশ্বাসই করতে পারত না যে, এগুলি হযরত আকদসের রচনা। তাদের ধারণা ছিল যে, তিনি এই উদ্দেশ্যে একদল উলেমাকে গোপনে নিযুক্ত করে রেখেছেন। একবার এক মৌলবী সাহেব এই উলেমাদের সেই গোপন দলটির হদিস জনার জন্য কাদিয়ান আসেন। তিনি রাত্রিতে মসজিদে মুবারকে যান। মুনশী যাফর আহমদ সাহেব কপুরথলবী সেই সময় মসজিদ মুবারক সংলগ্ন কক্ষে অবস্থান করছিলেন। মৌলবী সাহেব হযরত মুনশী সাহেবকে জিজ্ঞাসা করেন, ‘মির্যা সাহেবের আরবী রচনা এমন বাগ্মীতাপূর্ণ ভাষার নিদর্শন যে সেই তুল্য বাগ্মীতাপূর্ণ রচনা কেউ লিখতে পারে না। মির্যা সাহেব নিশ্চয় কয়েকজন উলেমার কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে লেখেন। আর রাত্রিতেই সেই কাজ সম্ভব। আপনার কাছে কি রাত্রিতে এমন কিছু মানুষ থাকেন যারা তাঁকে এই কাজে সহায়তা করে? হযরত মুনশী সাহেব বললেন, মৌলবী মহম্মদ চিরাগ সাহেব এবং মৌলবী মঈন সাহেব তাঁর কাছে থাকেন অবশ্য। তাঁরা রাত্রিতে সাহায্য করেন নিশ্চয়। হযরত আকদসের কানে মুনশী সাহেবের এই কথা পৌঁছলে তিনি খুব হাসেন। কেননা মৌলবী মহম্মদ চিরাগ সাহেব এবং মৌলবী মঈনুদ্দীন সাহেব উভয়ে হুযুরের নিরক্ষর কর্মী ছিলেন। এরপর মৌলবী সাহেব সেখান থেকে চলে যান। পরের দিন যখন হুযুর আসরের সময় মসজিদে রীতি মত বসলেন, তখন মৌলবী সাহেবও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হুযুর মুনশী সাহেবের দিকে দেখে হেসে বললেন, রাত্রের সেই উলমার সঙ্গে পরিচয় তো করিয়ে দিন। সেই হুযুর মৌলবী আব্দুল করীম সাহেবকেও রাতের ঘটনা শোনান। তিনিও হাসতে শুরু করেন। হযরত মুনশী সাহেব মহম্মদ চিরাগ ও মঈনুদ্দীন সাহেবকে ডেকে মৌলবী সাহেবের সামনে দাঁড় করিয়ে দেন। সেই মৌলবী সাহেব এই দুই ‘উলেমা’কে দেখে সেখান থেকে চলে গেলেন এবং একটি প্রকান্ড আকারের থালায় শিরনী নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং নিজের বারোজন সঙ্গীসহ হুযুর আকদসের হাতে বয়আত করলেন।

(তারিখে আহমদীয়াত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৪৭২-৪৭৫)

* * *

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আঁ হযরত (সা.) বলেছেন: যে **ব্যক্তি কারো মধ্যে কোন ত্রুটি বা দুর্বলতা দেখা সত্ত্বেও তা গোপন রেখেছে, তার উপমা সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে সমাধিস্ত এক জীবিত শিশুকন্যাকে কবর থেকে উদ্ধার করে তার প্রাণ রক্ষা করেছে।**

(সুনান আবু দাউদ)

দোয়াপ্রার্থী: **Abdus Salam, Nararvita (Assam)**

থাকে তাহলে এবার কোন ক্রমেই আপনি এড়িয়ে যাবেন না। আর এই পুস্তিকায় যদি কোন ভুল প্রমাণিত হয় তাহলে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক পুস্তিকার ভুল-ভ্রান্তি থেকে যত বেশি সংখ্যায় (ভুল) পাওয়া যাবে সেই প্রত্যেক বাড়তি ভুলের জন্য আপনাকে এক রূপী করে দেওয়া হবে। এই আবদনের মেয়াদকাল ২৫ শে জুলাই, ১৮৯৪ পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। আপনি ২৫ শে জুলাই, ১৮৯৪ পর্যন্ত বিজ্ঞাপন আকারে ছাপিয়ে এই আবেদন যদি প্রেরণ না করেন তা হলে মনে করা হবে, আপনি এক্ষেত্রেও পলায়ন করেছেন।

(সিররুল খিলাফা, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৪১৭)

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) পরে এই পুরস্কার রাশি বাড়িয়ে দুটাকা করে দেন। কিন্তু ভুল বের করার এবং পুরস্কার পাওয়ার জন্য তিনি কয়েকটি শর্ত নির্ধারণ করেন। এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

“অধিকাংশ ত্বরাপরায়ণ সমালোচক বিশেষ করে শেষ মুহাম্মদ হোসেন সাহেব বাটালভী আমাদের আরবী পুস্তকগুলোকে সমালোচনার দৃষ্টিতে দেখেন, বিদ্বেষের অন্ধকারে নিমজ্জিত হওয়ার কারণে লিপিকারের প্রমাদকেও ‘ভুল’ হিসাবে আখ্যায়িত করেন। আমাদের কোন শব্দ ব্যাকরণের দৃষ্টিকোণ থেকে শুধু তখনই ভ্রান্তি বলে গণ্য হবে যদি এর বিপরীতে সেই কথা আমাদের অন্যান্য পুস্তকের কোথাও শুদ্ধভাবে লেখা না থাকে। কোন স্থানে ঘটনাক্রমে যদি ভুল হয়ে যায় অথচ সেই এক শব্দ বা বচন অন্য দশ, কুড়ি বা পঞ্চাশ জায়গায় যদি নির্ভুলভাবে ব্যবহার হয়ে থাকে তাহলে ন্যায়পরায়ণতা ও ঈমানের দাবি হল ‘ভুল’ না বলে এটিকে লিপিকারের (অর্থাৎ কাতেবের) প্রমাদ বলে গণ্য করা। অপরদিকে যে দ্রুতগতিতে এগুলি লেখা হয়েছে যদি তা দৃষ্টিতে রাখা হয় তাহলে তারা যে অনেক বড় অন্যায় করেছে আর এ লেখাগুলো যে অলৌকিক-একথা তাদের মানতেই হবে। কুরআন শরীফ ছাড়া মানুষের কোন লেখা প্রমাদ ও ভ্রান্তিমুক্ত হতে পারে না। বাটালভী সাহেব নিজেও মানেন, মানুষ ইমরাউল কায়স এবং হারীরীর মত লেখকেরও ভুল ধরেছে। প্রশ্ন হল, ঘটনাক্রমে কোন ব্যক্তি একটি ভুল ধরতে পারলেও সে কি হারীরী বা ইমরাউল কায়সের সমকক্ষ হতে পারে? মোটেও না। সূক্ষ্ম, তাত্ত্বিক কথা বলা বড়ই কঠিন কিন্তু ছিদ্রান্বেষণ একজন সামান্য যোগ্যতার মানুষ বা একজন অথর্বও করতে পারে। আমাদের পক্ষ থেকে ‘হামামাতুল বুশরা’ ও ‘নুরুল হক’ -এর মোকাবেলায় বই লেখার জন্য ১৮৯৪ সনের জুন মাসের শেষ দিন পর্যন্ত সময় দেওয়া হয়েছিল কিন্তু তা-ও গত হয়ে গেছে। কোন মৌলভী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বই লেখার উদ্দেশ্যে পুরস্কারের টাকা প্রদান করার আবেদন পত্র পাঠায় নি। এখন সে সময়ও হাতছাড়া হয়ে গেছে। অবশ্য তারা অযোগ্য ও ঈর্ষাপরায়ণ লোকদের স্থায়ী রীতি অনুসারে ছিদ্রান্বেষণের অনেক হীন চেষ্টা করেছে। কয়েকজন আত্মপ্রসাদে অভ্যস্ত ব্যক্তি লিপিকারের কিছু প্রমাদ বা অনিচ্ছাকৃত ভ্রান্তি দেখিয়ে পুরস্কারের প্রত্যাশী হয়েছে। তারা চোখ খুলে এটিও দেখল না যে প্রতিটি ভুল ধরার পুরস্কারের জন্য শর্ত ছিল, এমন ব্যক্তিকে প্রথমে পাল্টা একটি পুস্তক লিখতে হবে নতুবা ঈর্ষাপরায়ণ ও অজ্ঞ সমালোচক পৃথিবীতে হাজার হাজার বরং লক্ষ লক্ষ পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে কয়জনকে আর কাকে কাকে পুরস্কার দেওয়া যেতে পারে? প্রথমে তাদের এই ‘সিররুল খিলাফাহ’ পুস্তিকার মোকাবেলায় পুস্তক লেখা উচিত আর যদি তাদের পুস্তিকা ভ্রান্তিমুক্ত প্রমাণিত হয় আর বাগ্মিতার মাপকাঠিতে আমাদের পুস্তিকার সমমানের প্রমাণিত হয় তাহলে আমাদের কাছ থেকে তিনি পুরস্কারের টাকা ছাড়া প্রতিটি ভুলের জন্যও দুই টাকা করে নিতে পারেন যার আমরা কথা দিয়েছি। নতুবা অহেতুক সমালোচনা শালীনতা-বিবর্জিত একটি কাজ হবে।

ওয়াসসালাম আলা মানিত তাবাআল হুদা।

(সিররুল খিলাফা, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৩১৬)

এখন নীচে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কয়েকটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব যা থেকে বোঝা যাবে শেখ মহম্মদ হোসেন বাটালবী বাস্তবে আরবীর বিরাট কোন পণ্ডিত ছিলেন না, আর তিনি কখনও আরবীতে কোন পদ্য বা গদ্যও রচনা করেন নি। তিনি ফার্সিরও বিজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন না। সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন–

অতঃপর শেখ বাটালবী সাহেব আমাদের পুস্তক ‘তবলীগ’ এর কিছু ভুল বের করেছেন বলে আত্মপ্রসাদ নিচ্ছেন। আমরা আক্ষেপের সাথে লিখছি, অন্ধ-বিদ্বেষ বা অজ্ঞানতার কারণে সঠিক এবং ব্যাকরণের রীতিসম্মত শব্দ বিন্যাসকেও তিনি ভুল আখ্যা দিয়েছেন। এ কাজের জন্য যদি বিশেষ কোন সভার আয়োজন করা হয়, তাহলে আমরা তাকে বুঝিয়ে দিতে পারি, এরূপ তড়িঘড়ির ফলে কি কি লাঞ্ছনা পোহাতে হয়। কিয়ামতের নিদর্শনাবলী প্রকাশ পেয়ে গেছে, কিন্তু আপনার তা বোঝার সামর্থ্য নেই। এই হল জ্ঞানের বহর! এতদসত্ত্বেও মৌলবী হওয়ার দাবি! ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেউন। ’ যে সব ভুল-ত্রুটি তিনি বড় কষ্ট করে উদ্ঘাটন করেছেন এসব জড় করে যদি একত্রে লেখা হয় তাহলে দুই অথবা দেড় লাইনের কাছাকাছি হবে। এর বেশির ভাগই ছিল লিপিকারের ভুল-ত্রুটি। এবং তিন ভুল প্রুফ রিডিং এর সুযোগ না থাকার কারণে বা দৃষ্টি এড়িয়ে যাওয়ার কারণে রয়ে গিয়েছিল। এছাড়া বাকী শেখ সাহেবের নিজ জ্ঞানের সংকীর্ণতা ও বোঝার ঘাটতি। এতে প্রমাণিত হয়, শেখ সাহেব কখনই আরবী ভাষা শেখার প্রতি মনোযোগ দেন নি। তিনি মুখ যদি বন্ধ রাখতেন এবং নিজের নগ্নতা প্রকাশ না করতেন তাহলে ভাল হত। আমাদের সেই মনোবাঞ্ছা অপূর্ণই থেকে গেল, শেখ সাহেব কবে আমাদের পুস্তকাদির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গদ্য ও পদ্য সম্বলিত বাগ্মিতাপূর্ণ একটি পুস্তিকা প্রকাশ করবেন এবং আমাদের কাছ থেকে পুরস্কার নিবেন আর প্রকৃতপক্ষেই মৌলবী ও আরবী ভাষাবিদ হওয়ার স্বীকৃতি আদায় করবেন।

(সিররুল খিলাফা, রূহানী খাযায়েন, ৮ম খণ্ড, পৃ: ৪১৫)

তিনি বলেন- এখানে একথাও স্মরণ রাখা দরকার যে, শেখ বাটালভী এই অধমের কয়েকটি আরবী রচনা থেকে যতগুলি ভুল বের করেছেন, তা থেকে কেবল এতুটুকুই প্রমাণ হয় যে এখন সেই শেখের নির্লজ্জতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যেখানে সঠিকও তার দৃষ্টিতে ভুল আর বাক্যালংকার যুক্ত বাগ্মিতাপূর্ণ ভাষাকেও সে অলংকার বর্জিত দেখছে। এই নিবোর্ধ শেখ কতদূর পর্যন্ত নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করবে আর কি কি লাঞ্ছনা তার ভাগ্যে অপেক্ষা করছে তা জানা নেই। কয়েকজন বিজ্ঞ সাহিত্যিক তার এই সব প্রলাপ শুনে এবং এই ধরণের সমালোচনা সম্পর্কে অবগত হয়ে আক্ষেপ করছিলেন যে, এই ব্যক্তি কেন এমন অজ্ঞতার পঙ্কিলে আবদ্ধ হল?

(কেরামাতিস সাদেকীন, রূহানী খাযায়েন, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৬৩)

‘আমি শ্রোতাদেরকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, শেখ বাটালবী আরবী সম্পর্কে তাঁর কোনও জ্ঞান নেই। ভুল বের করা সেই সব লোকের কাজ যারা আধুনিক সাহিত্য ও প্রাচীন আরবের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে বাগধারা এবং .... সম্পর্কে তারা অবহিত থাকে এবং হাজর আরবী কবিতা তাদের দৃষ্টিপটে থাকে...... কিন্তু এই হতভাগা শেখ যে কিনা উর্দু লিখেই নিজের চুল সাদা করে ফেলল, সে আরবী সাহিত্য ও বাগ্মিতা সম্পর্কে কিই বা জানে। কেউ কি কখনও এই বুযুর্গকে দুই চারশ আরবী পঙক্তি পদ্য হিসেবে প্রকাশ করতে দেখেছে বা শুনেছে? আমি তো মোটেই এতটুকুও আশা করি না যে, সে বাগ্মিতাপূর্ণ আরবীতে একটি পঙক্তিও রচনা করতে পারে বা বাগ্মিতাকে অনিবার্য রেখে একটি স্তবকও আরবী রচনা করতে পারে। তবে উর্দুতে তার দক্ষতা নিয়ে সন্দেহ নেই।”

(কেরামাতিস সাদেকীন, রূহানী খাযায়েন, ৭ম খণ্ড, পৃ: ৬৪)

মসজিদ মুবারক (ইসলামাবাদ, যুক্তরাজ্য)

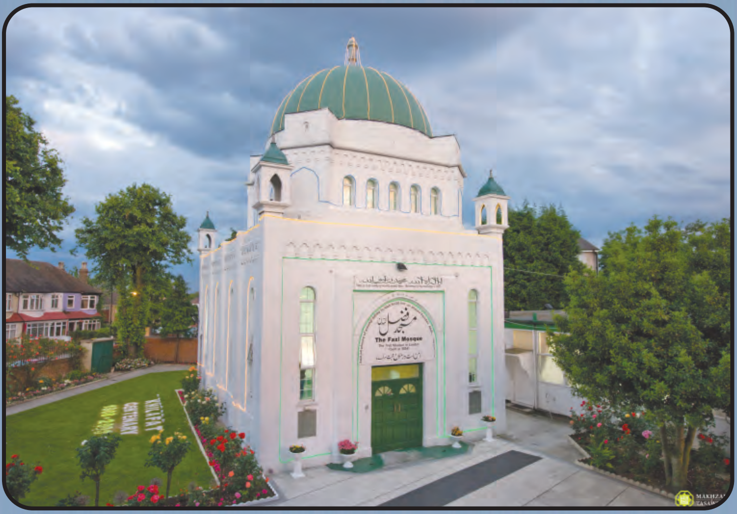

মসজিদ ফজল (লন্ডন, যুক্তরাজ্য)

মসজিদ নুসরাত জাহাঁ,(কোপেনহেগন, ডেনমার্ক)

মসজিদ আকসা (রাবওয়াহ, পাকিস্তান)

মসজিদ মসরূর (ভার্জিনিয়া, যুক্তরাষ্ট্র)

মসজিদ বায়তুল আহাদ (নাগোয়া, জাপান)

মসজিদ বায়তুস সামাদ (বাল্টিমোর, যুক্তরাষ্ট্র)

মসজিদ বায়তুল হামীদ (ফিল্ডা, জার্মানী)

জামাত আহমদীয়া আজ বিশ্বের ২১৩টি দেশে প্রতিষ্ঠিত। আলহামদোলিল্লাহ। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জামাত আহমদীয়া দ্বারা নির্মিত গুটিকয়েক মসজিদের নয়নভিরাম চিত্র।

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Mobile: +91 9 679 481 821
E-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

The Weekly **BADAR** *Qadian*
Qadian - 143516 Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA

Vol.6 Thursday 4-11- March-2021 Issue. 9-10

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mobile : +91 99153 79255
e -mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL Rs.500/-

হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মসীহ্ মওউদ দামাস্কের পূর্ব দিকে মিনারের নিকট অবতরণ করবেন।

বন্ধুগণ! এই মিনার এই জন্য নির্মাণ করা হচ্ছে যাতে এটি হাদীস অনুসারে মসীহ মওউদ এর যুগের স্মারক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।

এই মিনারাতুল মসীহও দামাস্কের পূর্ব দিকে অবস্থিত।

বন্ধুগণ! এই মিনার এই জন্য নির্মাণ করা হচ্ছে যাতে এটি হাদীস অনুসারে মসীহ মওউদ এর যুগের স্মারক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায় আর সেই মহান ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণতা লাভ করে যার উল্লেখ করা হয়েছে কুরআনের এই আয়াতে-

سُبۡحٰنَ الَّذِیۡۤ اَسۡرٰی بِعَبۡدِہٖ لَیۡلًا مِّنَ الۡمَسۡجِدِ الۡحَرَامِ اِلَی الۡمَسۡجِدِ الۡاَقۡصَا الَّذِیۡ بٰرَکۡنَا حَوۡلَہٗ

[অর্থাৎ তিনি পরম পবিত্র ও মহিমাময়, যিনি রাত্রিযোগে স্বীয় বান্দাকে মসজিদুল হারাম (সম্মানিত মসজিদ) হইতে মসজিদুল আকসা (দূরবর্তী মসজিদ) পর্যন্ত লইয়া গেলেন, যাহার চতুষ্পার্শ্বকে আমরা বরকতমণ্ডিত করিয়াছি।- আল ইসরা: ২] এবং যে মিনার সম্পর্কে হাদীসেও এই ভবিষ্যদ্বাণী আছে যে মসীহ্ মিনারের কাছে অবতরণ করবে। মুসলিম বর্ণিত এই হাদীসে দামাস্ক-এর যে উল্লেখ পাওয়া যায়, তার দ্বারা বোঝানো হয়েছে যে, সর্বপ্রথম দামাস্ক থেকেই তিন খোদার ধারণার উদ্ভব ঘটেছে। আর মসীহ্ মওউদ অবতরণ করবেন ত্রিত্ববাদের সেই অবধারণাকে মুছে দিয়ে পৃথিবীতে পুনরায় এক খোদার পরাক্রম প্রতিষ্ঠিত করতে। অতএব এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, মসীহ্র মিনার, যার নিকট তার অবতরণ হবে, সেটি দামাস্কের পূর্বদিকে অবস্থিত। আর একথাও সত্যি। কেননা পাঞ্জাবের গুরুদাসপুর জেলা স্থিত কাদিয়ান দামাস্কের ঠিক পূর্বদিকে অবস্থিত, এবং লাহোর যার দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। কাজেই এর থেকে প্রমাণ হয় যে মিনারাতুল মসীহও দামাস্কের পূর্ব দিকে অবস্থিত।.... প্রত্যেক সত্যান্বেষীর উচিত 'দামাস্ক শব্দটি নিয়ে গভীর দৃষ্টিতে প্রণিধান করা যে এর মধ্যে কোন প্রজ্ঞা নিহিত আছে। কেননা লেখা আছে যে মসীহ দামাস্কের পূর্ব দিকে অবতরণ করবেন।...... আমার বিরুদ্ধবাদীরা দামাস্ক সংক্রান্ত হাদীসটি বার বার পড়লেও তারা এটিকে কেবল একটি কেচ্ছাকাহিনী হিসেবে ধরে নিয়েছে। কিন্তু স্মরণ থাকে, এটি কাহিনী নয়, আর খোদা তা'লা অনর্থক কাজ থেকে পবিত্র। বস্তুত এই হাদীসের এই শব্দগুলিতে প্রথমে যে দামস্ক শব্দের উল্লেখ রয়েছে এবং অতঃপর এর পূর্বদিকে একটি মিনার নির্ধারণ করলেন, এর মধ্যে এক বিরাট রহস্য নিহিত আছে। আর এটি সেই রহস্যই যা এইমাত্র আমি বর্ণনা করেছি। অর্থাৎ ত্রিত্ববাদ বা তিন খোদার ভিত দামাস্কেই রচিত হয়েছিল। .... মহা শিরকের এই বিষবৃক্ষ সর্বপ্রথম দামাস্কেই অঙ্কুরিত হয়েছিল এবং কালক্রমে তা অন্যত্র বিস্তার লাভ করতে থাকে। অতএব, খোদা তা'লা যেহেতু জানতেন যে মানুষকে খোদাতে পরিণত করার সূত্রপাত সর্বপ্রথম দামাস্কেই হয়েছে, এই কারণে তিনি সেই যুগের কথা, যখন কিনা খোদার আত্মাভিমান মিথ্যা শিক্ষা ধ্বংস করে ফেলবে, উল্লেখ করার পর দামাস্কের উল্লেখ করে বলেছেন, মসীহর মিনার অর্থাৎ সেই জ্যোতির বিকাশস্থল দামাস্কের পূর্ব দিকে অবস্থিত। এই বক্তব্যের এই উদ্দেশ্য ছিল না যে, সেই মিনার দামাস্কেরই একটি অংশ এবং তা দামাস্কে অবস্থিত; দুর্ভাগ্যক্রমে যেমনটি ধারণা করা হয়েছে। বরং এর অর্থ হল, মসীহ্ মওউদ এর জ্যোতি দামাস্কের পূর্ব দিক থেকে সূর্যের ন্যায় উদিত হয়ে পাশ্চাত্যের অন্ধকার দূর করবে। এটি একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ছিল, কেননা মসীহ্র মিনারকে, যার নিকট তার অবতরণ স্থল, দামাস্কের পূর্বদিকে অবস্থিত বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আর দামাস্কের ত্রিত্ববাদকে এর পশ্চিম দিকে রাখা হয়েছে। এভাবে সুদূর ভবিষ্যত সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করেছে যে, যখন মসীহ মওউদ আসবেন, তখন তিনি পূর্ব দিক থেকে আবির্ভূত হবেন, যেভাবে সূর্য পূর্ব দিক থেকে উদিত হয়। এর বিপরীতে ত্রিত্ববাদের নিষ্প্রভ প্রদীপ, যা পশ্চিম দিকে অবস্থিত, তা ক্রমশ স্তিমিত হতে থাকবে। কেননা খোদার কেতাবে পূর্ব দিক থেকে উদিত হওয়া উত্থানের লক্ষণ হিসেবে আখ্যায়িত হয়েছে আর পশ্চিমের দিকে ঢলে পড়া পতনের লক্ষণ হিসেবে।

(মাজমুয়ায়ে ইশতেহারাত, ৩য় খণ্ড, পৃ: ২৮৭-২৯৪)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir
প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে। প্রো: তত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান